

দারিদ্র্য বিমোচনে জেন্ডার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন তত্ত্ব

কাজী হাসান ইমাম *

Abstract : *The expected Poverty Reduction (PR) and optimum National Productivity (NP) can be achieved when both men and women are developed as Human Resources (HR) with equal importance and they can work supportively together with their full potential. The measures of poverty and NP are generally depicted in a manner more economically tuned rather than socially valued. Women's contribution to economic development in the past often went unmeasured and unrecognized. Their potential were ignored, their access to services, assets and opportunities were restricted, rationed and sometimes denied by the patriarchal society. As a result, their productivity relative to their potential remained low. Social re-engineering of the existing value systems through gender-friendly attitudinal changes of people in the society would increase their productivity, which in turn, would help them possess social and economic strengths, reduce poverty and achieve higher NP. Social re-engineering of value systems calls for effective and sustainable training capable of changing attitudes of the society towards gender issues. Imparting such training to the concerned stakeholder groups, specially the Government officials, the key social change-agents in the developing nations, would be a step forward to this end. Gender-Training carried out so far around the developing world has never been able to address the problems emanating from the deep-rooted patriarchal attitudes of the society, rather it has become to be the charity functions of the sponsoring development partners. The new systems approach developed to design gender-training based on social engineering of attitudes would eventually demolish the existing attitudinal barriers creating dysfunctional impacts on Poverty Reduction Systems Strategies (PRSS) and Productivity Relations Systems (PRS) and would be of immense help for reversing women's roles in development. This would obviously, in turn, help reduce poverty in a logarithmic rate and achieve higher national productivity in its optimum level.*

* উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

১.০ ভূমিকা

কোন দেশ বা সমাজ-গোষ্ঠীর দারিদ্র্যের প্রকৃতি নিরূপণে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত অসংখ্য পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে গৃহীত হয়েছে নানা অর্থনৈতিক কর্মকৌশল। জন্মলগ্ন থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ নিরন্তর সংগ্রাম করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের এই নিরন্তর সংগ্রামের সর্বশেষ প্রয়াস হচ্ছে “দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল” বা Poverty Reduction Strategy (PRS)। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ‘দারিদ্র্য’কে সাধারণভাবে “মানব দারিদ্র্য সূচি” বা Human Poverty Index বা HPI-হিসেবে পরিমাপ করা হয়। “মানব দারিদ্র্য সূচি” মানুষের জীবন-যুদ্ধের বঞ্চনা ও জ্ঞান, সামাজিক বঞ্চনা এবং অর্থনৈতিক সঙ্গতিকে বিবেচনায় আনে (UNDP, 2003, pp. 1-5)। দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কোন জাতি তার সম্ভরণ সম্পদসমূহকে (input resources) কত দক্ষতার সাথে উৎপাদ পণ্যে বা সেবায় রূপান্তর করতে পারে, “জাতীয় উৎপাদনশীলতা” হচ্ছে তার একটি যৌগিক পরিমাপক (Web Site (2002).: Strategis.gc.ca, p. 1.)। কোন দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থবহ উন্নতি বিধানের ক্ষমতা বহুবিধ ফ্যাক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে মানব সম্পদকে কেন্দ্রীয় ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের দেশের মোট শ্রম-শক্তির অর্ধাংশই নারী। সুতরাং প্রত্যাশিত দারিদ্র্য বিমোচন ও কাম্য জাতীয় উৎপাদনশীলতা অর্জন অত্যাবশ্যকীয়ভাবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগুরুত্বে মানব সম্পদ উন্নয়ন, উন্নয়নে সমভাবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং সকল কর্ম-পরিসরে উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা ও পূর্ণ স্থৈতিকতা সমৃদ্ধ উন্নয়ন প্রয়াসের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর বিদ্যমান বঞ্চনায় তাদের পূর্ণ স্থৈতিকতায় আত্ম-প্রকাশের অবকাশ খুবই কম। অতীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদানকে গণ্য করা হয়নি এবং তা স্বীকৃতিও পায়নি। তাদের স্থৈতিকতা এখনো অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। সেবা, সম্পদ ও সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের অধিকার অত্যন্ত সীমিত (restricted), সংবিত্ত (rationed) এবং কখনো বা অগ্রাহ্যিত (denied)। মূলত নারীর এই গভীর বঞ্চনা তাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিহীন করে রেখেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কাম্য উৎপাদনশীলতা অর্জন সম্ভব হচ্ছেনা। জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন নারীকে বিদ্যমান বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিতে পারে, যা প্রকারান্তে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যোগাবে এবং উন্নয়নে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। ফলে তা দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়নে প্রয়োজন সমাজে বিদ্যমান জেডার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনায়নে সমর্থ্য ফলপ্রসূ ও টেকসই প্রশিক্ষণের।

প্রশিক্ষণ একটি ধারাবাহিক বা চলমান (Continuous) প্রক্রিয়া। মানব উন্নয়ন ও সমাজ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের প্রকৃতি ও ধরন উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর (target population) সামাজিক উন্নয়নের স্তর ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন সমাজের

জেভার ধারণা তার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় অনুশীলন, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কালিক ও স্থানিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের বহমান ধারায় সমাজের এ বৈশিষ্ট্যাবলী সতত পরিবর্তনশীল। সুতরাং ফলপ্রসূ জেভার প্রশিক্ষণ ডিজাইনে উদ্দিষ্ট সমাজের এ সম্পর্কিত বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষিত ধারা অনুসৃত হওয়া অত্যাাবশ্যক।

“জেভার উন্নয়ন” নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। জেভার-বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পশ্চাৎপদতার কারণে “জেভার উন্নয়ন” মূলত নারী-কেন্দ্রিকরূপে প্রতিভাত হয়। দেশ, সমাজ ও সম্প্রদায় ভেদে নারীর অবস্থান (Status) ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে কোন সমাজে নারীর ভিন্নতর অবস্থানের প্রকৃতি নির্ধারণে প্রযুক্ত ফ্যাক্টরগুলো কী অবয়বে কাজ করে তা’ বিভিন্ন ইস্যুতে নারীর প্রতি উপর্যুক্ত সমাজের “দৃষ্টিভঙ্গি”র (Attitudes) মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এ কারণে “নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি”-নির্ভর এ্যাপ্রোচ জেভার প্রশিক্ষণ ডিজাইনে একটি মৌলিক ও অনন্য এ্যাপ্রোচ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মূলত সমাজে নারীকে আমরা কী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি ?

নারীর কোন আত্ম-পরিচয় নেই ! সে কখনো কারো মা, কারো বোন, কারো কন্যা, কখনো বা কারো স্ত্রী ইত্যাদি — পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বাস্তবত এটাই হচ্ছে নারীর তথাকথিত সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান। ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘকাল সারা বিশ্বে এটিই ছিল নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের বাস্তব চিত্র। কালের অবধারিত প্রবাহে আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারায় এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশে সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। জনসংখ্যার বর্ধিষ্ণু প্রবৃদ্ধি ও ভূমি-মানুষের প্রতিকূল অনুপাত মানুষের জীবন-যাপন প্রণালীকে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিজের অধিকার, ক্ষমতা ও উন্নয়ন সম্পর্কে আগের তুলনায় অধিকতর সচেতন ও আত্ম-প্রত্যয়ী করে তুলছে। অন্যদিকে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশ অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে। ফলে নারীর “কুলবধূ”-চিত্রটি ধীরে ধীরে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে^১ এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে, বেঁচে থাকার তাগিদে অথবা অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন ব্যবস্থার তাড়নায় উন্নয়নে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ছে। আর তাই নারীর কথিত “কোমল হাত”^২ ক্রমশ জীবন সংগ্রামের বলিষ্ঠ হাতিয়ারে রূপান্তরিত হচ্ছে। মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানগত এ

^১ “কুলবধূ”-র ধারণাটি মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লালিত একটি মৌলবাদী চেতনার প্রকাশ, যেখানে অবরুদ্ধ গৃহ-জীবনই নারীর অবধারিত ও অনিবার্য পরিণতি এবং সেটাই তাদের জন্য সবচেয়ে সম্মানের বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে প্রগতিশীল সমাজের দৃষ্টিকোণে নারীর নিজস্ব স্বত্ত্বা-বিকাশে “কুলবধূ”-র ধারণাটিই প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত এবং বঞ্চনার শুরু মূলত এখান থেকেই।

^২ “কোমল হাত” কথাটি নিঃসন্দেহে শ্রুতি মধুর, কিন্তু সম্মানের নয়। আর এটি হচ্ছে সমাজ-সৃষ্ট এক সুদূর প্রসারী জেভার বিভেদ — শ্রম-বিভাজিত এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পশ্চাৎপদ করে রাখার এক অনন্য কৌশল।

পরিবর্তন পৃথিবীর সব দেশে এবং সব কালে একই হারে ঘটেনি। তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে সারা বিশ্বে পরিবর্তিত হয়েছে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এখনো নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি।

দীর্ঘ-দশক উন্নয়ন প্রয়াসের পর পেশাজীবীরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, শুধু সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণেই যে উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক তা-ই নয়, দারিদ্র্য বিমোচনেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা-বিশ্লেষণে আলোকে বিশ্বব্যাংকের “Enhancing Women’s Participation in Economic Development” শীর্ষক নীতিপত্র অভিমত পোষণ করেছে যে, নারীর অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকার সমর্থন প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে, শিশুর উদ্বর্তন (child survival) এবং সামগ্রিকভাবে পারিবারিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায়, জন্মহার হ্রাস করে এবং ফলত তা জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হ্রাসে সহায়তা করে (The World Bank, 1994, p. 7)। এই জ্ঞাত প্রত্যর্পণ (known returns) সত্ত্বেও উন্নয়নে অবদান রাখা ও উন্নয়নের সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলারা নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধাগুলো শুরু হয় মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে তুলনামূলক নিম্ন বিনিয়োগ দিয়ে এবং তা অব্যাহত থাকে সম্পদ ও সেবার ক্ষেত্রে তাদের সীমিত প্রবেশাধিকারের (access) মাধ্যমে। আর মহিলাদের সুযোগ গ্রহণের ওপর আরোপিত আইন ও প্রথাগত বিধি-নিষেধ এবং অনুশীলন এ অবস্থাকে আরো নাজুক করে তোলে। ফলে বিগত কয়েক দশকের উন্নয়ন অগ্রগতি আনুপাতিক হারে মহিলাদের জন্য প্রত্যাশিত সুবিধা বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি (The World Bank, 1994, p. 10)। অধিকতর সমতাভিত্তিক^৩ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, বিশেষত নারীর সমতায়ন^৪ ব্যাহত হচ্ছে মূলত রাজনৈতিক স্বদৃষ্টিতার অভাব ও নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার কারণে (Sen, 1994, p. 28)।

^৩ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে সমতার নীতি অবৈষম্যমূলক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমতার নীতির বাস্তব প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে নারী বা অন্যান্য পশ্চাৎপদ সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। সমতার নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, যেকোন উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের শারীরিক ভিন্নতার কারণে দৃষ্টিগ্রাহ্য অথবা সামাজিকভাবে জেড়ার বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ অতিক্রম করা — নারী-পুরুষের শারীরিক ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা নয়।

^৪ সমতায়নের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ নারী-পুরুষের শারীরিক ও সামাজিক অবস্থাগত ভিন্নতাকে বিবেচনায় নিলেও তারা মূলত নারীকে দুর্বল ও অনুপোষিত হিসেবে চিহ্নিত করে এবং উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ না করে (যেমন সমাজ-সংস্কার বা নারীর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণ) বরং নারীকে বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেয় (যেমন রাষ্ট্রিকালীন কাজে নারীর পরিবর্তে অধিকহারে পুরুষদেরকে নিয়োগ করা, এখানে নারী কর্ম-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়)। সমতার নীতি মূলত নারীর প্রতি সমান আচরণ নয়, নারীর জন্য সমান প্রবেশাধিকার (access) এবং সমান ফলাফলের (result) ওপর গুরুত্ব দেয়।

১.১ জেভার প্রশিক্ষণে বিদ্যমান এ্যাপ্রোচসমূহ বিশ্লেষণ

প্রশিক্ষণ ডিজাইনে অসংখ্য সিস্টেমস এ্যাপ্রোচ ব্যবহৃত হতে পারে। কালিক প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক নারী উন্নয়নের বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এটা কখনো কল্যাণ (welfare), কখনো সক্ষমতা (efficiency) বৃদ্ধি, দারিদ্র্য প্রতিরোধ (anti-poverty), সমতা (equity) এবং কখনো বা আবার ক্ষমতায়ন (empowerment) ও মূলস্রোতধারায়ন (mainstreaming) ইত্যাদি দৃষ্টিকোণে দেখা হয়েছে (UNDP-FEMNET, 2000, pp. 5-6)। জেভার প্রশিক্ষণ সাহিত্যে প্রশিক্ষণ ডিজাইনে মূলত পাঁচটি সিস্টেমস এ্যাপ্রোচের প্রচলন দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে : (১) ধারণাগত এ্যাপ্রোচ (The Conceptual Approach), (২) নীতি-বিশ্লেষণ এ্যাপ্রোচ (The Policy Analysis Approach), (৩) প্রায়োগিক এ্যাপ্রোচ (The Empirical Approach), (৪) কর্ম-প্রতিফলন এ্যাপ্রোচ (The Action-Reflection Approach) এবং (৫) অভিজ্ঞতাপ্রসূত এ্যাপ্রোচ (The Experiential Approach)। জেভার প্রশিক্ষণ বিশারদগণ বিদ্যমান সিস্টেমস এ্যাপ্রোচকে মূলত উপর্যুক্ত পাঁচটি ভাগে (Royal Tropical Institute, 1998, pp. 38-43) বিভক্ত করলেও বাস্তবত প্রশিক্ষণ সাহিত্যে ভিন্ন ধারার আরো কতগুলো উল্লেখযোগ্য সিস্টেমস এ্যাপ্রোচের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এগুলো হচ্ছে : (৬) নারী-কল্যাণ এ্যাপ্রোচ (The Women's Welfare Approach), (৭) প্রাতিষ্ঠানিক এ্যাপ্রোচ (The Institutional Approach), (৮) জেভার-চাহিদা এ্যাপ্রোচ (The Gender-Needs Approach), (৯) সামাজিক উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ (The Social Development Approach), এবং (১০) অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা এ্যাপ্রোচ (The Participatory Workshop Approach) ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত এ্যাপ্রোচগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ্যাপ্রোচগুলোর মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রাবরণ (Overlapping) রয়েছে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রয়েছে এগুলোর প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, এগুলোর মধ্যে কোন এ্যাপ্রোচই একক-অনুশীলনে জেভার উন্নয়নের মূল লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়। এ্যাপ্রোচগুলো অনেকাংশে বিক্ষিপ্ত এবং জেভার উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবত এগুলো আদৌ কোন প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে কি-না সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে সংশয় রয়েছে (Abu-Habib, Lina, 1998, p. 60)। কাসেন্টের মতে, জেভার প্রশিক্ষণ মূলত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। এটি এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি এবং বিদ্যমান পরিসরে এটি টেকসই হবারও কোন অবকাশ নেই। বিদ্যমান বিভিন্ন সিস্টেমস এ্যাপ্রোচের আওতায় নকশায়িত (Designed) জেভার প্রশিক্ষণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আদৌ কোন উপকারে আসে কি-না বা এ প্রশিক্ষণ কথিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সমর্থ কি-না, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সংশয়-মিশ্রিত প্রশ্ন এখন খুবই জোরে-সোরে উচ্চারিত হচ্ছে (Kasente, H. Deborah, 1998, p. 65-67)। বিশেষজ্ঞদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মূলত জেভার প্রশিক্ষণকে কেউই ধারণ (own) করেনা।

ফলপ্রসূ ও টেকসই জেভার প্রশিক্ষণ প্রদানে সত্যিকার অর্থে কারো কোন প্রশিক্ষণ এজেভা নেই। উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ পেলে এবং সময় থাকলে সংশ্লিষ্টরা এ জাতীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন (Abu-Habib, Lina, 1998, p. 61)। উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত পরিচালিত জেভার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিদ্যমান বাস্তবতায় উন্নয়ন সহযোগীদের নিছক দাতব্য কার্যক্রমে (Charity Functions) পরিণত হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক স্বজন-প্রীতির বেড়াজালে তাদের স্থানীয় সহযোগী হিসেবে কিছু কিছু চমৎকার জন-সংযোগের অধিকারী লোক (!) রাতারাতি বিশেষজ্ঞ পরামর্শক হিসেবে আবির্ভূত হন এবং এই দাতব্য কার্যক্রমে তাঁদের অমূল্য অবদানের (!) সম্মানীস্বরূপ বিদ্যমান বাজার মূল্যের বহু-গুণীতক হারে পারিতোষিক লাভ করেন। আর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের নামে গৃহীত সমাজে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রকল্পটির একদিন এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তা পরবর্তী উন্নয়নে আর একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের দ্বার উন্মোচন করে।

জাতি সংঘের মোড়কে বৈশ্বিক জেভার উন্নয়নে গলদ-ঘর্ম উন্নয়ন সহযোগীদের আপ্রাণ প্রয়াসের পরেও জেভার প্রশিক্ষণ ডিজাইনে একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ সিস্টেমস এ্যাপ্রোচ উদ্ভাবনের শূন্যতা রয়েছে। বিদ্যমান সমীক্ষায় এ শূন্যতা পূরণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তবে একথা স্মার্তব্য যে, কোন জনগোষ্ঠীর জেভার উন্নয়ন ধারণাটি তার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় মূল্যবোধ, অনুশীলন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

১.২ উৎপাদনশীলতা ও দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতিসমূহের জেভার সম্পর্ক

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধ সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। সভ্যতার ক্রমবিকাশে এ যুদ্ধের প্রকৃতি পাটেছে, পাটেছে যুদ্ধের কর্ম-কৌশল। গৃহীত কর্ম-কৌশলের ধারা পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন ও উৎপাদনশীলতার সাথে অন্যান্য সম্ভবণ পদ্ধতিসমূহের (input systems) নির্ণীত সম্পর্ক অনুধাবনের মাধ্যমে। দারিদ্র্যের সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক বহু শতাব্দী আগে থেকেই প্রতিপাদিত। কিন্তু দারিদ্র্য ও উৎপাদনশীলতার জেভার সম্পর্ক জনারণ্যে খুব একটা স্পষ্ট নয়। মূলত এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কটি অত্যন্ত গ্রন্থিল (knotty) এবং পারস্পরিকভাবে ক্রিয়াশীল। তবে মানব সম্পদ উন্নয়ন যে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার, স্থৈতিক শ্রম-শক্তির (potential workforce) অর্ধাংশকে বাইরে রেখে কাম্য উৎপাদন ও উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব নয় এবং সমাজের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও বর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক চাপ নিরসনে জেভার নির্বিশেষে নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণ যে ক্রমশই অনিবার্য হয়ে পড়ছে, এ বিষয়গুলো ধীরে ধীরে বিশেষজ্ঞদের অনুধাবনে আসছে। সমাজের বিদ্যমান জেভার-দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সম্ভরণ-উৎপাদ (input-output) পদ্ধতিসমূহে, বিশেষত উৎপাদনশীলতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রযুক্ত ফ্যাক্টরগুলোর ওপর কি প্রভাব সৃষ্টি করছে, প্রায়োগিক পরিসরে এগুলোর প্রতিক্রিয়াসমূহ কি ইত্যাদি বর্তমান সমীক্ষায় বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং বর্ণিত

প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিরসনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কর্ম-কৌশলসমূহকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া জরুরী সেগুলোও চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.০ দারিদ্র্য বিমোচনে জেভার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়। এ কারণে উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। দেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেই দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে এমনটিও ভাবার অবকাশ নেই। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, “চুইয়ে পড়া”^৫ অর্থনীতি সমাজে অর্থনৈতিক মেরুকরণ (economic polarization) সৃষ্টি করে, উন্নয়নের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর (রহঃবহঃফঃ নবঃবঃভঃপরঃধঃতঃরঃ) পরিবর্তে শুধুমাত্র সমাজের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর উপকারে আসে (Hirschman, 1967, p. 107) এবং ফলত তা সমাজের বিপন্ন মানুষের বঞ্চনার হার আরো বাড়িয়ে দেয় (ইমাম, ২০০৩, পৃ. ২৩১)। সুতরাং সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক হওয়া অত্যাাবশ্যক। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারী মানব দারিদ্র্য (Women Human Poverty) অত্যন্ত প্রকট। সামগ্রিকভাবে সমাজের বিভিন্ন সম্পদ, সেবা ও সুবিধাদিতে নারীর অধিকার (rights) ও প্রবেশাধিকার (access) অত্যন্ত সীমিত। সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে এ বৈষম্যাবস্থা বর্ণনাতীতভাবে তীব্র। এ কারণে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণে তাদের উৎপাদনশীলতাও প্রায় শূন্যের কোটায়। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হলে যেমন প্রত্যক্ষভাবে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যাাবশ্যক, তেমনি বর্ধিত উৎপাদনশীলতায় তাদের ভোগাধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তার অর্থ হচ্ছে, একদিকে যেমন তাদেরকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে হবে, অন্যদিকে উন্নয়নের সুফল যেন তারা ভোগ করতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ততা যেন সুবিধাভোগীদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে পরিণত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া অত্যাাবশ্যক।

পরিবার হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক। একটি দরিদ্র পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি উৎপাদনহীন বা উৎপাদন-বিমুখ নারীকেও যদি উৎপাদন কার্যক্রমে^৬ সম্পৃক্ত করা যায়, তবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা তথা অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি তাদেরকে সমাজের বিভিন্ন সেবা ও সুবিধাদিতে প্রবেশ লাভের সুযোগ করে দেবে

^৫ “চুইয়ে পড়া” অর্থনীতির ধারণায় সমাজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলে তার একটি অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশের আপামর জনসাধারণ পাবে। অর্থাৎ আপামর জনসাধারণের কাছেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যাবে এবং সমাজে শনৈঃশনৈঃ উন্নতি আসবে। কিন্তু বাস্তবত তা পৃথিবীর কোথাও দেখা যায়নি।

^৬ উৎপাদন বলতে এখানে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণে বিবেচ্য উৎপাদন কার্যক্রমকে নির্দেশ করা হয়েছে, যার অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ (economic return) সম্ভব।

এবং একই সাথে তাদের ভোগ-চাহিদায় পরিবর্তন আসবে। এভাবে উৎপাদন কার্যক্রমে নারীর সম্পৃক্তির মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক অংশে সৃষ্ট ভোগ-চাহিদার পরিবর্তন সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনবে — পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা সেবা উৎপাদনে এবং ক্রমান্বয়ে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন দক্ষতায় পরিণত হবে। তাদের উৎপাদন স্থৈতিকতা ও অর্থনৈতিক প্রত্যর্পণ হারের (economic rate of return) স্থৈতিকতা বৃদ্ধি পাবে। পেশায়, কর্মসংস্থানে ও শ্রম-বিভাজনে বহুমুখীতা আসবে এবং বাজার চাহিদার আলোকে সমাজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আর এসবের মিলিত ফল সমাজ তথা রাষ্ট্রে একটি নতুন মাত্রার উৎপাদনশীলতার সক্রিয়তা বা গতিশীলতা (productivity dynamics) সৃষ্টি করবে, যা প্রকারান্তরে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ঘটানোসহ দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়াকে দ্রুত ত্বরান্বিত করবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উৎপাদনহীন বা উৎপাদন-বিমুখ নারীকে কিভাবে উৎপাদন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যায়? তার এই উৎপাদনহীনতা বা উৎপাদন-বিমুখতার জন্য শুধু কর্মসংস্থানের অভাবই নয়, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব এবং নানা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। এগুলোর উত্তরণ ঘটিয়ে নারীকে উৎপাদনশীল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হলে রাষ্ট্রীয়ভাবে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত উপযুক্ত নীতি-সহায়তা (policy support) এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ ও তার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। তবে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, একজন প্রান্তিক চাষী বা একজন ভূমিহীন কৃষক অথবা একজন দিনমজুর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরও সে কৈন দরিদ্র? তার উৎপাদনহীন বা উৎপাদন-বিমুখ সহধর্মিনীকে যদি উৎপাদন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে তাদের পারিবারিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, পরিবারে বাড়তি আয়ের সংস্থান হবে। তাতে তাদের দারিদ্র্যের তীব্রতাও হয়তো কিয়দাংশে বা বহুলাংশে কমবে। কিন্তু এতে কি সত্যিকার অর্থে তাদের টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন ঘটবে? অথবা সামাজিক শোষণ-বঞ্চনায় তারা যে আবারো কোন ভিন্ন প্রকৃতির “দারিদ্র্যের দুষ্ট-গর্ভে” নিপতিত হবেনা তার নিশ্চয়তা কোথায়? স্বাধীনতাত্তোরকালে কয়েক দফায় ভূমি-মালিকানার সিলিং পদ্ধতির প্রবর্তন করা হলেও তাতে চতুর ভূস্বামীদের দারুন বিচক্ষণতায়^৮ ভূমিহীন কৃষক বা দিনমজুরের সম্পদাধিকারে কোন পরিবর্তন আসেনি। শুধু কর ব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, ভূস্বামীদের সিলিং বহির্ভূত জমি বন্টনের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য

^৭ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, আশির দশকের মধ্যভাগে গ্রামাঞ্চলে অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের উন্নতি হওয়ার কারণে বিবেচনাযোগ্য মাত্রায় দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। কিন্তু সময়ানুক্রম উপাত্ত (time series data) বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্ণিত সময়ের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি ছিল ক্ষণস্থায়ী বা অ-টেকসই। সিদ্দিক, আবু বকর (১৯৯৩): “বাংলাদেশের পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল”. সম্পাদনায় : আহমেদ, নাসির উদ্দীন ও মোহাম্মদ তারেক. : উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২০৩।

^৮ ৬০ বিঘা পর্যন্ত ভূমি-মালিকানার সিলিং প্রবর্তিত হওয়ার পর ভূস্বামীরা রাতারাতি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের নামে, বিভিন্ন নামে ও বেনামে তাদের জমির নাম-পত্তন করে। ফলে প্রকৃত বিচারে ভূমি-মালিকানার কোন পরিবর্তন ঘটে না।

বিমোচনের অন্যতম লক্ষ্য নিয়ে সত্তরের দশকে ভূমি-মালিকানার সিলিং পদ্ধতির প্রবর্তন করা হলেও নগর দারিদ্র্য বিমোচনে পুঁজিপতিদের ধনভান্ডারের দিকে ফিরেও তাকানো হয়নি। “গুচ্ছগ্রামের” বা “আশ্রয়ন” অথবা “আবাসনের” সাধু প্রয়াস^{১০} উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের অতল-গর্ভ থেকে তুলে আনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সফলতা দেখাতে পারেনি। “সামাজিক বনায়ন” কর্মসূচি ভিন্ন আঙিকে সফলতা অর্জন করলেও^{১১} এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের দৌরাতে সরকারি খাস জমি ও বনাঞ্চল বেদখল হচ্ছে বলে অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। দারিদ্র্য বিমোচনের অনন্য কৌশল হিসেবে বিবেচিত “ছাগল উন্নয়ন” কর্মসূচিতে সরকারের ব্যাপক সহায়তা সম্প্রসারিত হলেও তা এখন পর্যন্ত আশানুরূপ ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি। সরকার কর্তৃক গৃহীত বয়স্ক ভাতা, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, VGD (Vulnerable Group Development) বা VGF (Vulnerable Group Feeding), GR (Gratuitous Relief) এবং TR (Test Relief) বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি কর্মসূচি দৈত্যকুলের “জিওন কাঠির”^{১২} মত স্বপ্নপুরীর রাজকন্যাকে (দারিদ্র্যের অতল-গর্ভে নিমজ্জিত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে) জাগিয়ে তুলতে পারেনি। তাহলে তাদের নিরাপত্তা-জাল/বেষ্টনী (safety net) এবং নিরাপত্তা-মই/সিঁড়ি (safety ladder) কি, যা তাদেরকে দারিদ্র্যের অতল-গর্ভে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং দারিদ্র্যের উত্তরণে তাদের সামনে একটি স্বপ্নের সিঁড়ি হিসেবে আবির্ভূত হবে? এগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে বাংলাদেশে বিদ্যমান দারিদ্র্যের প্রকৃতি এবং দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের নির্দেশকগুলো (indicators) কি সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

তবে, তার আগে আরো একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার। উৎপাদনহীন বা উৎপাদন-বিমুখ নারী কিন্তু কর্ম-বিমুখ বা কর্মহীন নয়। নারী যদি উৎপাদনশীল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয় এবং একই সাথে প্রজনন দায়িত্বের^{১৩} সবটুকুই তাকে পালন করতে হয়, তবে

^{১০} “গুচ্ছগ্রাম” প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক ও চরম দারিদ্র্যে নিপতিত জনগোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সরকারের খাস জমিতে বাসস্থানের সংস্থান করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে আর্থিক সহায়তা বা আবাদযোগ্য খাসজমি বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রকল্পটি কখনো আবার আশ্রয়ন এবং আবাসন নামে বাস্তবায়ন করা হয়।

^{১১} দেশের ব্যাপক বনোজাড় রোধে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আশির দশকের মধ্যভাগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে এ কর্মসূচিতে তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়। ফলে একদিকে এ কর্মসূচি যেমন “গাছ লাগাও, পরিবেশ বাঁচাও” শ্লোগানের সফলতা এনে দেয়, অন্যদিকে তা স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়-সংস্থানের সুযোগ করে দেয়। কিন্তু বর্তমানে সুযোগ স্বাক্ষরী প্রভাবশালী মহল এ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে এবং সংশ্লিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শুধু শ্রমজীবী হিসেবে পরিগণিত করে সামাজিক বনায়নের অংশীদারিত্বের সুফল তারাই ভোগ করছে।

^{১২} “জিওন কাঠি” হচ্ছে পৌরাণিক গাঁথায় বর্ণিত যাদুর কাঠি, যা দিয়ে দৈত্যকুলে অপহৃত রাজকুমারীকে অতল ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখা হয় এবং কাঠির অবস্থানের পরিবর্তনের মাধ্যমে অতল ঘুমে নিমজ্জিত রাজকুমারীকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়। এখানে জাগিয়ে তোলার বিষয়টি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

^{১৩} প্রজনন দায়িত্ব বলতে সন্তান জন্মদান ছাড়াও সন্তানের লালন-পালন ও গৃহ পরিচর্যা (রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, ঘর-দোর পরিষ্কার করা, পানি ও জ্বালানী সংগ্রহ এবং অসুস্থের সেবা-যত্নসহ গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ) ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তা তাকে মানবীয়ভাবে অসম্ভব বোঝায় ভারাক্রান্ত করবে। সেক্ষেত্রে জীবনসঙ্গী পুরুষ কি তার সামাজিক কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে তথাকথিত পৌরুষের অবাঞ্ছিত অহংবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারীর স্বক্কে নিপতিত প্রজনন দায়িত্বে সহযোগিতার বা অংশদারিত্বের হাত সম্প্রসারিত করবে ?

২.১ দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং উত্তরণের নির্দেশকসমূহ

দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও নিবিড়তার আঙ্গিকে দারিদ্র্যকে “অনপেক্ষ দারিদ্র্য” (absolute poverty) ও “আপেক্ষিক দারিদ্র্য” (relative poverty) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। দারিদ্র্যকে আবার “আয়-দারিদ্র্য” (income poverty) এবং “ক্যালোরি গ্রহণ দারিদ্র্য” (calorie-intake poverty) এ দু’ভাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা^{১০} পূরণের প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা সংস্থানের অভাবই হচ্ছে অনপেক্ষ দারিদ্র্য। সমাজে অনপেক্ষ দারিদ্র্যের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দুর্ভিক্ষ/মঙ্গা, বঞ্চনা, ভূমিহীনতা, বেকারত্ব, শিশুশ্রম, নিরক্ষরতা, ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং মৌলিক চাহিদা সেবায় প্রবেশাধিকারের অভাব ইত্যাদি। অন্যদিকে পূর্ণ স্থিতিকতায় বিকাশ লাভ এবং পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজে অবদান রাখার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদিতে প্রবেশাধিকারের অভাবই হচ্ছে আপেক্ষিক দারিদ্র্য। আপেক্ষিক দারিদ্র্যের কারণে মানুষের মর্যাদা, আত্ম-সম্মানবোধ, সমতা, প্রাধিকার, অংশগ্রহণ এবং লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ (gainful employment opportunity) ইত্যাদির অভাব দেখা দেয় (Neaz, 2005, pp. 172-173)। কোন দেশের দারিদ্র্যাবস্থা পরিমাপে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গিনি সূচক, “মানব দারিদ্র্য সূচি” বা Human Poverty Index, মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ক্যালোরি গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য খাদ্য-শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake বা FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালোরি গ্রহণ (Direct Calorie Intake বা DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হ’ত। দারিদ্র্য পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো-ক্যালোরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্যসীমা এবং ১৮০৫ কিলো-ক্যালোরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্যসীমা (Hard-core Poverty or Extreme Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে “মৌলিক চাহিদা ব্যয়” (Cost of Basic Needs বা CBN) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যা ২০০০ সালে পরিচালিত জরিপেও অনুসৃত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (non-food) ভোগ্য-পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার প্রতিবছর দারিদ্র্যাবস্থা পরিবীক্ষণের জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে দেশে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ (Poverty Monitoring Survey বা PMS) পদ্ধতি চালু করা হয়^{১৪}। খাদ্য-শক্তি গ্রহণ ও প্রত্যক্ষ ক্যালোরি গ্রহণ পদ্ধতিদ্বয়

^{১০} মৌলিক চাহিদা বলতে সাধারণভাবে মানুষের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সংস্থানকে বোঝায়।

^{১৪} PMS পদ্ধতিটি তুলনামূলক অনেক কম সংখ্যক নমুনা অন্তর্ভুক্ত করে বিধায় দেশের দারিদ্র্যাবস্থা বিশ্লেষণে এর গ্রহণযোগ্যতা/নির্ভরযোগ্যতা অপেক্ষাকৃত কম।

পরস্পর তুলনায়োগ্য না হলেও এখানে এ দু'টি পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত ভোগ্য পণ্যের চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশে শহরাঞ্চলের জন্য জনপ্রতি মাসিক মোট ব্যয় ৯০৫.৯০ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলের জন্য ৫৯৪.৬০ টাকা ধরে দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হয় (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫, পৃ. ১৬৪)।

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নব্বুইয়ের দশকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে বিশেষত শহরাঞ্চলে আয়-বৈষম্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে [সারণি-১]। মৌলিক-চাহিদা ব্যয় পরিমাপের আলোকে সময়ানুক্রম উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নব্বুইয়ের দশকের প্রারম্ভ থেকে উর্ধ্ব ও নিম্ন দারিদ্র্যরেখা উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে দারিদ্র্যাবস্থার ক্রমশ উন্নতি ঘটেছে। এ সময়ে শহরাঞ্চলে মাথাপিছু আয় খুব দ্রুত বৃদ্ধি ঘটলেও খুব সম্ভবত দরিদ্র জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক (pro-poor) প্রবৃদ্ধির কারণে গভীরতা ও নিবিড়তার আলোকে শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে বৃহত্তর দারিদ্র্য হ্রাস ঘটেছে [সারণি-২] (The World Bank and Asian Development Bank, 2003, pp. 4-5)। কর্মসংস্থানের সীমিত পরিসর ও কাম্য বৈচিত্রের অভাবে শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার বেশি। দেশের প্রশাসনিক অঞ্চলভেদেও দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও নিবিড়তা ভিন্ন। তুলনামূলক বিচারে দেশের উত্তরাঞ্চলে (রাজশাহী বিভাগে) দারিদ্র্যের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি এবং চট্টগ্রাম বিভাগে চরম দারিদ্র্যের প্রকোপ সবচেয়ে কম [সারণি-৩]। সম্ভব কারণেই দেশের উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু মাসিক আয়ের পরিমাণ সবচেয়ে কম। উর্ধ্ব দারিদ্র্যরেখার আঙ্গিকে চট্টগ্রাম বিভাগের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু মাসিক আয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হলেও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বরিশাল বিভাগের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু মাসিক আয় সবচেয়ে বেশি [সারণি-৪]। চরম দরিদ্র ও দরিদ্র উভয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই রাজশাহী বিভাগের মাথাপিছু মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ সবচেয়ে কম এবং চট্টগ্রাম বিভাগে তা সবচেয়ে বেশি [সারণি-৫]। দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ পরিসংখ্যানেও দেখা গেছে, জাতীয়, শহর ও গ্রামাঞ্চল সকল পর্যায়েই মাথাপিছু মাসিক আয় ক্রমবর্ধমান। তবে শহরাঞ্চলে এ বৃদ্ধির পরিমাণ গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা অনেক বেশি [সারণি-৬]। খাদ্য শক্তি গ্রহণ পদ্ধতি অনুসারে সকল পর্যায়েই দারিদ্র্যের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। তবে প্রত্যক্ষ ক্যালোরি গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের হার অপেক্ষাকৃত দ্রুত হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় [সারণি-৭]। এ পদ্ধতিতে সকল পর্যায়েই চরম দারিদ্র্য পরিস্থিতিরও হ্রাসমান প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় [সারণি-৮]। বিগত প্রায় দু'দশক ধরে মানব দারিদ্র্য সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশের দারিদ্র্য ২.৫৪% হারে হ্রাস পেলেও এ সময়ে আয়-দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে মাত্র ১.৪৫% হারে (The Government of the People's Republic of Bangladesh, 2005, p. 12)।

সারণি-১ : বাংলাদেশে বৈষম্যের প্রবণতা (Gini Coefficients)

অঞ্চল	উর্ধ্ব দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে			নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে		
	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০
জাতীয়	৫৮.৮	৫১.০	৪৯.৮	৪২.৭	৩৪.৪	৩৩.৭
শহরাঞ্চল	৪৪.৯	২৯.৪	৩৬.৬	২৩.৩	১৩.৭	১৯.১
গ্রামাঞ্চল	৬১.২	৫৫.২	৫৩.০	৪৬.০	৩৮.৫	৩৭.৪

উৎস : The World Bank and Asian Development Bank (2003) : *Poverty in Bangladesh : Building on Progress*. Dhaka, p. 7.

নোট : The Gini Coefficients are defined for the distributions of real per capita expenditures. The upper and lower poverty line estimates refer to the use of corresponding poverty line as the regional price index for deflating nominal per capita expenditures.

সারণি-২ : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রবণতা (CBN Poverty Measures)

অঞ্চল ও গণনার প্রকৃতি	উর্ধ্ব দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে			নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে		
	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০
মাথা গণনার হার						
জাতীয়	৫৮.৮	৫১.০	৪৯.৮	৪২.৭	৩৪.৪	৩৩.৭
শহরাঞ্চল	৪৪.৯	২৯.৪	৩৬.৬	২৩.৩	১৩.৭	১৯.১
গ্রামাঞ্চল	৬১.২	৫৫.২	৫৩.০	৪৬.০	৩৮.৫	৩৭.৪
দারিদ্র্যের ব্যবধান (ক _১)						
জাতীয়	১৭.২	১৩.৩	১২.৯	১০.৭	৭.৬	৭.৩
শহরাঞ্চল	১২.০	৭.২	৯.৫	৪.৯	২.৬	৩.৮
গ্রামাঞ্চল	১৮.১	১৪.৫	১৩.৮	১১.৭	৮.৬	৭.৩
বর্গকৃত দারিদ্র্যের ব্যবধান (ক _২)						
জাতীয়	৬.৮	৪.৮	৪.৬	৩.৯	২.৫	২.৩
শহরাঞ্চল	৪.৪	২.৫	৩.৪	১.৫	০.৭	১.২
গ্রামাঞ্চল	৭.২	৫.৩	৪.৯	৪.৩	২.৮	২.৬

উৎস : The World Bank and Asian Development Bank (2003) : *Poverty in Bangladesh : Building on Progress*. Dhaka, p. 4.

নোট : The poverty gap (ক_১) estimates how far below the poverty line the poor are on average as a proportion of that line. The squared poverty gap (ক_২) takes into account not only the distance separating the poor from the poverty line, but also inequality among the poor.

সারণি-৩ : বাংলাদেশের বিভাগ-ওয়ারী দারিদ্র্যের প্রবণতা - ২০০০ (CBN Poverty Measures)

অঞ্চল	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে			উর্ধ্ব দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে		
	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
জাতীয়	৩৩.৭	৩৭.৪	১৯.১	৪৯.৮	৫৩.১	৩৬.৬
বরিশাল	২৮.৮	২৯.৬	১৯.৫	৩৯.৮	৪০.০	৩৭.৯
চট্টগ্রাম	২৫.০	২৫.৩	২৩.৩	৪৭.৭	৪৮.৪	৪৪.০
ঢাকা	৩২.০	৪১.৭	১২.০	৪৪.৮	৫২.৯	২৮.২
খুলনা	৩৫.৪	৩৬.৮	২৭.৫	৫১.৪	৫২.২	৪৭.১
রাজশাহী	৪৬.৭	৪৮.৮	৩২.৩	৬১.০	৬২.৮	৪৮.১

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০০০ ।

সারণি-৪ : বাংলাদেশের বিভাগ-ওয়ারী মাথাপিছু মাসিক আয় পরিস্থিতি- ২০০০

অঞ্চল	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে			উর্ধ্ব দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে		
	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
জাতীয়	৪৯৫.১৯	৪৮৪.৬৪	৫৭৭.৭৪	৫৭৩.৭২	৫৫০.৮২	৭০৫.৯৫
বরিশাল	৫৪৫.৩২	৫৩৯.৪২	৬৩৮.৭২	৫৮৩.০৭	৫৬৩.৬৫	৭৯৫.৯৫
চট্টগ্রাম	৫২২.৫৬	৪৯৭.৪৯	৬৫৭.৫৭	৬১৯.৩৯	৫৯৩.১৫	৭৬২.৩৭
ঢাকা	৪৭৫.৭৩	৪৬৭.৬৩	৫৩৩.৭৯	৫৪৯.৯৫	৫১৫.০৩	৬৪৮.৪২
খুলনা	৫৪৩.৪৬	৫৩২.৩৩	৬২৫.৯৪	৬৪১.০৭	৬২৫.৮৫	৭৩৪.৫০
রাজশাহী	৪৬৮.৮৯	৪৬৪.৫৫	৫১৪.৬০	৫২৬.৪৪	৫১৩.৯৫	৬৩৯.৯৪

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০০০ ।

সারণি-৫ : বাংলাদেশের বিভাগ-ওয়ারী মাথাপিছু মাসিক ব্যয় পরিস্থিতি- ২০০০

অঞ্চল	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে			উর্ধ্ব দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে		
	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
জাতীয়	৪৬০.৯১	৪৫৫.৪৩	৫০৩.৭৭	৫৩২.০৪	৫১৫.৩৭	৬২৮.২৯
বরিশাল	৪৫৮.৭৮	৪৫৭.৫৪	৪৭৮.৩৮	৫০৩.৭১	৪৯৫.৩৫	৫৯৫.৩৬
চট্টগ্রাম	৪৯৯.৮৬	৪৮৯.২৩	৫৫৭.০৭	৫৯৯.৪৫	৫৮৩.৪২	৬৮৬.৭৯
ঢাকা	৪৫৪.২৫	৪৪৫.৭৩	৫১৫.২৫	৫১৮.৯৫	৪৮৪.৩৭	৬৫২.১৪
খুলনা	৪৭৫.৬৫	৪৭৩.৭৬	৪৮৯.৭০	৫৩৩.০২	৫২২.৪৭	৫৯৭.৭৬
রাজশাহী	৪৩৮.২৫	৪৩৭.৯৭	৪৪১.১৮	৪৯০.৪১	৪৮৬.৯৪	৫২২.০২

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০০০।

সারণি-৬ : বাংলাদেশে খাদ্য শক্তি গ্রহণ (FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালোরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে তুলনামূলক দারিদ্র্য প্রবণতা-২০০৪

অঞ্চল	খাদ্য শক্তি গ্রহণ পদ্ধতি মাথা গণনার হার (%)		প্রত্যক্ষ ক্যালোরি গ্রহণ পদ্ধতি মাথা গণনার হার (%)	
	১৯৯৯	২০০৪	১৯৯৯	২০০৪
জাতীয়	৪৪.৭	৪২.১	৪৬.২	৪০.৯
শহরাঞ্চল	৪৩.৩	৩৭.৯	৪৯.৯	৪৩.৬
গ্রামাঞ্চল	৪৪.৯	৪৩.৩	৪৫.৬	৪০.১

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ-২০০৪।

সারণি-৭ : প্রত্যক্ষ ক্যালোরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের প্রবণতা-২০০৪

চরম দারিদ্র (≤১৮০৫ কিলো ক্যালোরি, %)	অঞ্চল	১৯৯৯	২০০৪
	জাতীয়	২৪.৯	১৮.৭
	শহরাঞ্চল	২৭.৩	২০.৮
	গ্রামাঞ্চল	২৬.৫	১৮.২

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ-২০০৪।

সারণি-৮ : মাথাপিছু মাসিক আয় ও ব্যয়-১৯৯৯ ও ২০০৪

অঞ্চল	মাথাপিছু মাসিক আয়						মাথাপিছু মাসিক ব্যয়					
	১৯৯৯			২০০৪			১৯৯৯			২০০৪		
	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র-নয়
জাতীয়	৯৪৮	৬০২	১২২৮	১১১৪	৬৩১	১৪৬৬	৮২৪	৪৪৬	১১২৮	৯৭৯	৪৮২	১৩৪১
শহর	১৬৭৮	৯০২	২২৭০	১৯২৩	৯২২	২৫৩২	১২৮৫	৬১৩	১৭৯৮	১৬২৭	৬৪১	২২২৮
গ্রাম	৮৩৯	৫৫৯	১০৬৭	৮৯৭	৫৬২	১১৫২	৭৫৫	৪২২	১০২৬	৮০৫	৪৪৫	১০৮০

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ-২০০৪।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ নিরূপণে খানা আয় ও ব্যয় জরিপের উপাত্ত নির্ভর এক প্রত্যাবৃত্তি বিশ্লেষণে^{১৫} (regression analysis) দেখা গেছে : (১) বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবার দারিদ্র্য প্রতিরোধে সক্ষম; (২) ছাত্রী-বৃত্তি কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক; (৩) পরিবার প্রধানের শিক্ষা ও অর্জিত দক্ষতার কারণে সংশ্লিষ্ট পরিবার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে পারে; (৪) কৃষি ভূমির মালিকানা সম্পন্ন পরিবার অপেক্ষাকৃত কম দরিদ্র; (৫) সম্পদ-আয় (asset income) সম্পন্ন পরিবার দরিদ্র নয়; এবং বৃহদাকৃতির পরিবারে দারিদ্র্যের সম্ভাবনা বেশি (The Government of the People's Republic of Bangladesh, 2005, p. 16)।

^{১৫} প্রত্যাবৃত্তি বিশ্লেষণে এক্ষেত্রে ৩টি শ্রেণীর ১০টি চলককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (ক) প্রথমত খানার গুণগত মান ও জনবিজ্ঞানীয় চলকসমূহ : যেমন পরিবার প্রধানের (১) জেভার, (২) শিক্ষার স্তর, (৩) দক্ষতার স্তর ও (৪) ধর্ম এবং পরিবারের (৫) আকার ও (৬) অবস্থান (গ্রামাঞ্চল বা শহরাঞ্চল) ; (খ) দ্বিতীয়ত নীতি পদক্ষেপ সম্পর্কিত চলকসমূহ যেমন, (৭) খানাটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কি নেই, ও (৮) খানাটি নারী শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত কি-না ; এবং (গ) তৃতীয়ত মালিকানা স্বত্ব যেমন, খানার (৯) ভূমি-মালিকানা ও সম্পদ এবং (১০) সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়।

দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার দৃষ্টিকোণে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিসরে কতিপয় উন্নয়ন সফলতার আলোকে বাংলাদেশকে দারিদ্র্য বিমোচনের স্থৈতিক ভিত্তি-ভূমি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : (১) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, (২) শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, (৩) সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির ব্যাপ্তি [Expanded Programme for Immunization (EPI) Coverage], (৪) বর্ধিত গড় আয়ু (life expectancy), (৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির/তালিকাভুক্তির বর্ধিষ্ণু হার এবং জেভার সমতায়ন ও নারী শিক্ষার প্রসার, (৬) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, (৭) পোল্ট্রি, ফিসারিজ, নার্সারী এবং সামাজিক বনায়নের সম্প্রসারণ, (৮) ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যুতায়ন ও রঙানি উন্নয়ন, (৯) স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি, স্বাস্থ্য সুবিধার সম্প্রসারণ, মাতৃজনিত মৃত্যু হারের হ্রাস এবং নিরাপদ পানির সংস্থান, (১০) উন্নয়নে নারীর বর্ধিষ্ণু অংশগ্রহণ, (১১) নারীর কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে পরিসর বৃদ্ধি, (১২) ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি, (১৩) বিধবা ও বয়স্ক ভাতার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা বেষ্টিত নারীর পরিধি বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি, (১৪) উন্নয়নের সমস্যা ও অপরিহার্য বিষয়াবলী সম্পর্কে জনারণ্যে বর্ধিষ্ণু সচেতনতা ইত্যাদি। অর্জিত এ সফলতার ওপর ভিত্তি করে সমাজের প্রতিটি স্তরে যথার্থভাবে জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন সম্ভব হলে দেশে একটি নতুন মাত্রার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টি হবে এবং ফলত দ্রুত বর্ধিত উৎপাদনশীলতা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে।

২.২ বর্ধিত উৎপাদনশীলতা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের বিকল্প পরিবেশনা পদ্ধতি

দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় বর্তমান সমীক্ষায় অবতারণিত জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন তত্ত্ব একটি বহুমাত্রিক মোড়ক প্রস্তাবনা (package proposal)। এ মোড়ক প্রস্তাবনাটি ৪টি মৌলিক পদ্ধতির রৈখিক ও যৌগিক কার্যক্রম সম্পর্কে চিত্রায়িত করে। এগুলো হচ্ছে : (১) উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতিসমূহ, (২) সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন পদ্ধতিসমূহ, (৩) উৎপাদ/কর্মদক্ষতা পদ্ধতিসমূহ এবং (৪) দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতিসমূহ [চিত্র-১]। উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতিসমূহ এবং সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন পদ্ধতিসমূহ পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া প্রকৃতির। সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতিসমূহ শারীরবৃত্তীয়, সামাজিক এবং নিয়ন্ত্রক/পরিচালন সম্ভরণ উপ-পদ্ধতিসমূহের একটি মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি পরিবেশে কাজ করে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে বিভিন্ন সম্ভরণ উপ-পদ্ধতিসমূহের মধ্যে বিরাজমান প্রতিটি একক উৎপাদনশীলতা কার্যক্রম এবং সামগ্রিকভাবে উৎপাদনশীলতা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রক/পরিচালন বা চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে [চিত্র-১]। প্রতিটি একক উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমের আবার সমকক্ষ জেভার প্রেক্ষিত (matched gender perspectives) বিদ্যমান। সুতরাং মানুষের জেভার দৃষ্টিভঙ্গির সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন প্রকারান্তরে উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতিসমূহ, এর সম্ভরণ উপ-পদ্ধতিসমূহ ও প্রতিটি একক উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমের ওপর অকার্যকর প্রভাব সৃষ্টিকারী বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীভূত করবে এবং অধিকতর দক্ষতা অর্জন, সেবা, সম্পদ ও সুবিধাদিতে সৃষ্ট নারীর অবৈষম্যমূলক ও উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার তাদের স্থৈতিকতার উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের উৎপাদ/কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে। ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন

ব্যবস্থায় তাদের বিদ্যমান ভূমিকার আমূল পরিবর্তন আসবে এবং ফলশ্রুতিতে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা অর্জিত হবে ও দারিদ্র্য বিমোচন ঘটবে। সামগ্রিকভাবে এ প্রস্তাবনাটি কিভাবে কাজ করবে নিম্নে তা বিস্তারিত পরিসরে আলোচনা করা হলো :

২.২.১ উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতিসমূহ

একজন মানুষের বিদ্যমান উৎপাদনশীলতা ও কাম্য উৎপাদনশীলতা এক নয়। বিদ্যমান উৎপাদনশীলতা হচ্ছে, বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে উৎপাদনশীলতার প্রযুক্ত সম্ভরণ-ফ্যাক্টরগুলো যে অবয়বে একজন মানুষের ওপর ক্রিয়াশীল তার ভিত্তিতে নিরূপিত তার অর্জিত উৎপাদন ক্ষমতা। অন্যদিকে কাম্য উৎপাদনশীলতা হচ্ছে, উৎপাদনশীলতার প্রযুক্ত সকল সম্ভরণ-ফ্যাক্টর তার ওপর সর্বোচ্চ মাত্রায় ইতিবাচকভাবে ক্রিয়াশীল হলে তার দ্বারা যে উৎপাদনশীলতা অর্জন করা সম্ভব হ'ত তার পরিমাণ। আবার বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে কোন মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যতটুকু উৎপাদনশীলতা অর্জন করা সম্ভব তা হচ্ছে তার বিদ্যমান উৎপাদনশীলতা-স্বৈতিকতা (productivity potential)। উৎপাদনশীলতার নিয়ামক বা পরিচালন ফ্যাক্টরগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে তার উৎপাদনশীলতা-স্বৈতিকতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব এবং এ উন্নীত উৎপাদনশীলতা-স্বৈতিকতার অবমুক্তির মাধ্যমে তার প্রকৃত বর্ধিত উৎপাদনশীলতা অর্জন করা সম্ভব।

বৈশিষ্ট্যগত দিক বিবেচনায় বর্তমান সমীক্ষায় উৎপাদনশীলতার নিয়ামক বা পরিচালন ফ্যাক্টরগুলোকে শারীরবৃত্তীয়, সামাজিক ও নিয়ন্ত্রক/পরিচালন এ তিনটি পৃথক সম্ভরণ উপ-পদ্ধতি হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। উপ-পদ্ধতিসমূহের আওতাধীন সম্ভরণ ফ্যাক্টরগুলো একদিকে যেমন একই উপ-পদ্ধতির আওতাধীন অন্যান্য সম্ভরণ ফ্যাক্টরের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়াশীল, অন্যদিকে তা অন্যান্য উপ-পদ্ধতির পৃথক পৃথক সম্ভরণ ফ্যাক্টরগুলোর সাথেও পারস্পরিক ক্রিয়াশীল। আবার একটি সামগ্রিক উপ-পদ্ধতির গুণগত পরিবর্তন একদিকে যেমন অন্যান্য উপ-পদ্ধতির আওতাধীন পৃথক পৃথক সম্ভরণ ফ্যাক্টরের গুণগত মান বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, অন্যদিকে তা অন্যান্য নির্দিষ্ট উপ-পদ্ধতির সামগ্রিক গুণগত মান বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

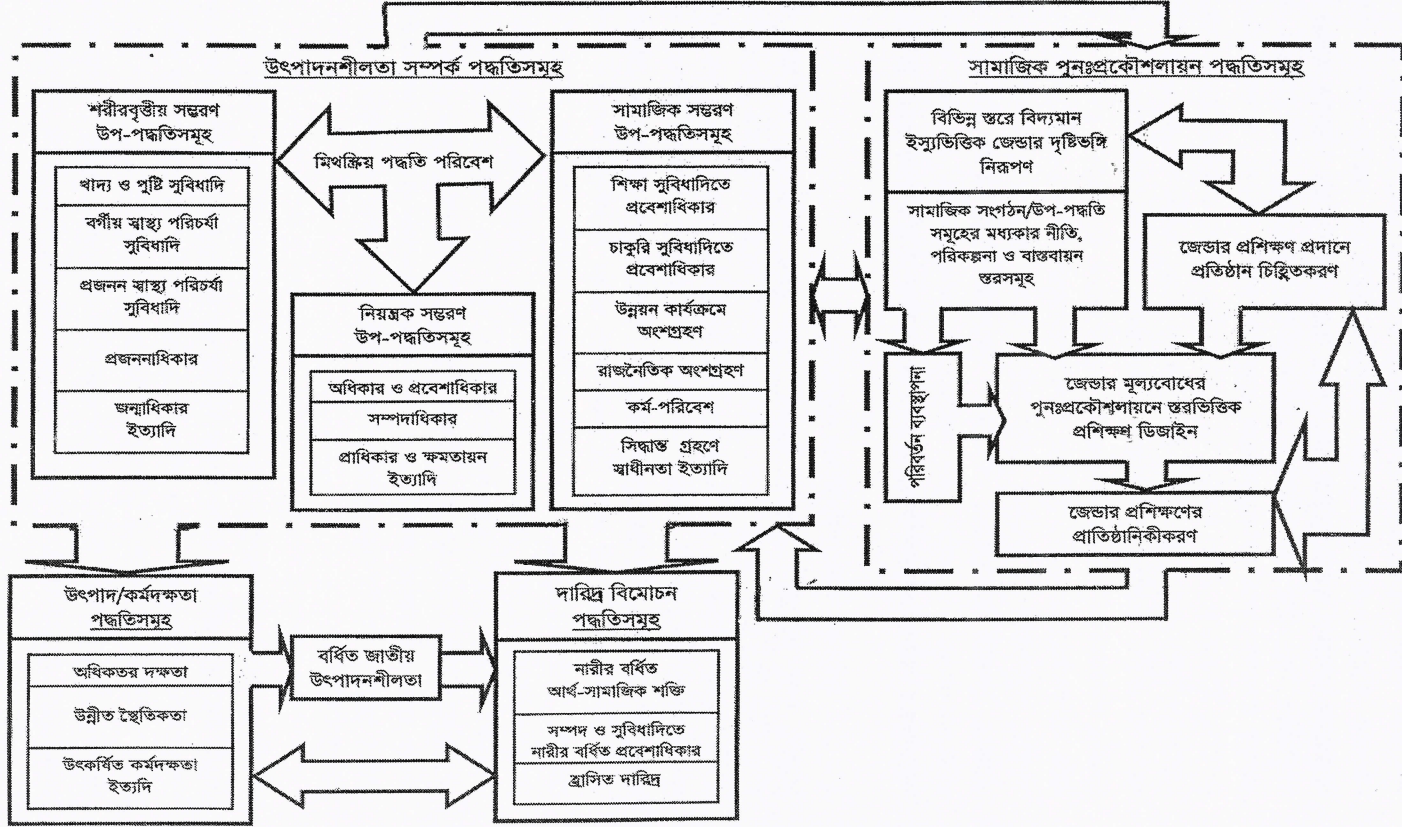
অর্থনীতিবিদগণের বিবেচনায় উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা কেন্দ্রীয় নিয়ামক হচ্ছে মানব সম্পদ। বর্ণিত সম্ভরণ উপ-পদ্ধতিসমূহ ও সম্ভরণ ফ্যাক্টরগুলো এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট নীতি, বিধি-বিধান ছাড়াও মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি পরিবেশে আরো কতগুলো বিষয় রয়েছে যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিশেষত নারী মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা মানুষের প্রকৃত উৎপাদনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এগুলোর অন্যতম হচ্ছে ধর্মীয় বিধি-বিধান, সংস্কার, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রচলন এবং জাতীয় পর্যায়ে থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রযোজ্য উৎপাদনশীলতার নীতি সমর্থন বা নীতি সহায়তা (policy support)। এগুলো যথার্থভাবে নিশ্চিত হলে মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটবে এবং প্রকৃত পক্ষে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা অর্জনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

মানব সম্পদের যথার্থ উন্নয়নে তথা কাম্য উৎপাদনশীলতা অর্জনে মানুষের শারীরবৃত্তীয় পূর্ণতা প্রাপ্তি অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটিয়ে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বা সামর্থ্যকে উন্নীত করে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পুরুষের শারীরবৃত্তীয় পূর্ণতা প্রাপ্তির অভাব তার ব্যক্তিক উৎপাদন সামর্থ্যকে ব্যাহত করে। কিন্তু নারীর শারীরবৃত্তীয় পূর্ণতা প্রাপ্তির অভাব জাতিগত সমস্যা হিসেবে পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হয় এবং তা শুধু নারীরই নয়, সামগ্রিকভাবে তা জাতীয় উৎপাদনশীলতাকে ব্যাহত করে (মজুমদার, ২০০৩)। তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা গেছে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নারী মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন ও করণভাবে বঞ্চনার শিকার (মজুমদার, ২০০৩)। আর এই বঞ্চনার কারণ যতটা না অর্থনৈতিক, তার থেকে অনেক অনেক বেশি নিবিড় হচ্ছে সমাজের জেডার দৃষ্টিভঙ্গিগত। সুতরাং সমাজের জেডার দৃষ্টিভঙ্গির পুনঃপ্রকৌশলায়ন শারীরবৃত্তীয় সম্ভরণ উপ-পদ্ধতিসমূহের ওপর দারুণভাবে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং ফলত তা জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সামাজিক সম্ভরণ ফ্যাক্টরগুলোর উন্নয়ন একদিকে যেমন মানুষের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়, অন্যদিকে তা সামাজিক সম্ভরণ সুবিধাদিতে মানুষের প্রবেশাধিকার ঘটিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের দ্বার উন্মোচন করে, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটায়, বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি-ভিত্তিতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে, যা তাদের কর্মক্ষমতা তথা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। উদাহরণত উপযুক্ত শিক্ষা শুধু একজন মানুষের জ্ঞানের প্রসারই ঘটায় না, বরং স্বাভাবজাত অন্তর্মুখীতার বেড়া জাল ভেঙ্গে মানুষকে বহির্মুখী হতে শেখায়, কর্মস্থানের^{১৬} দ্বার উন্মোচন করে ও পরিসর বৃদ্ধি করে, কর্মদক্ষতা বাড়ায় এবং অন্যান্য সামাজিক সুবিধাদিতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শক্তি-ভিত্তিতে তার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়, আর্থ-সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং সামগ্রিকভাবে তার উৎপাদনশীলতা বাড়ে। একইভাবে কর্মসংস্থানে প্রবেশাধিকার বা উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ তার জীবন যাপন পদ্ধতির পরিবর্তনসহ উৎপাদনশীলতায় অভাবনীয় গতিশীলতা সৃষ্টি করে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশের নারী সমাজ মারাত্মকভাবে সামাজিক সম্ভরণ-সুবিধা বঞ্চিত (ইমাম, ২০০৬, পৃ. : ৫৬-১১৭)। সামাজিক সংস্কারের কারণে দেশের অর্থনীতি মূলত পুরুষতান্ত্রিকতায় অথবা জেডার অন্ধত্বে ভোগে। আর এর কারণ মূলত সমাজে বিদ্যমান জেডার দৃষ্টিভঙ্গি। জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন সম্ভব হলে সামাজিক সম্ভরণ সুবিধায় নারীর অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটবে। ফলে বর্ধিষ্ণু হারে নারী বিদ্যমান অর্থনীতির বিচারে বিবেচিত উৎপাদন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবে। এতে একদিকে তারা যেমন স্বনির্ভর ও আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে উঠবে এবং তাদের নিজস্ব উৎপাদনশীলতা বাড়বে, যার সুবিধা তারা নিজেরাই ভোগ করতে পারবে। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে তা শ্রমবাজারে বর্ধিত শ্রমশক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে।

^{১৬} কর্মসংস্থানের বিষয়টি বর্তমান সমীক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে চাকুরি সুবিধা হিসেবে প্রতিপাদিত হয়েছে, যা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও চাকুরি দু'টি অর্থেই বিবেচ্য।

চিত্র-১ : দারিদ্র্য বিমোচন ও উৎপাদনশীলতার বিকল্প পরিবেশনা পদ্ধতি কাঠামো



উৎপাদনশীলতার শারীরবৃত্তীয় ও সামাজিক সম্ভরণসমূহের কার্যকারিতার ওপর নিয়ন্ত্রক বা পরিচালন সম্ভরণ ফ্যাক্টরগুলোর প্রভাব অপরিসীম। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নারীর অধিকার সংরক্ষণ, প্রাধিকার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানির সংস্থান, মাতৃজনিত মৃত্যু হার হ্রাস, উন্নয়নে নারীর বর্ধিষ্ণু অংশগ্রহণ, নারী কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বেশকিছু ইতিবাচক নীতি সমর্থন বা নতুন নতুন আইন প্রবর্তিত হলেও বাস্তবে তা আশানুরূপ ফলদায়ক হচ্ছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে, ধর্মীয় সংস্কার ও বিধি-নিষেধের আলোকে প্রণীত বাংলাদেশে বিদ্যমান এ সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ আইনসমূহ নারী অধিকার, জেভার সমতায়ন বা নারীর ক্ষমতায়নের অনুকূল নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তা এ সকল নীতি সমর্থন/সহযোগিতা বা আইনের সাথে দারুণভাবে দ্বন্দ্বিক। এছাড়া ধর্মীয় মূল্যবোধ, সংস্কার, সামাজিকভাবে প্রচলিত বিধানাবলী সমাজের রক্ত্রে রক্ত্রে গভীরভাবে গ্রোথিত। এক্ষেত্রে জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন হলে বিদ্যমান সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর হবে এবং শারীরবৃত্তীয়, সামাজিক ও নিয়ন্ত্রক বা পরিচালন সম্ভরণসমূহ নারীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

২.২.২ সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন পদ্ধতিসমূহ

আগেই বলা হয়েছে, “জেভার উন্নয়ন” নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইস্যুভিত্তিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে পুনঃপ্রকৌশলায়নের প্রকৃতি ও ধরন নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান সমীক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, জীবনের সর্ব পরিসরে জেভার সমতায়ন, জেভার মূলস্রোতধারায়ন, জেভার উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কাম্য উৎপাদনশীলতা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচন। সমীক্ষাটির মৌলিক ধারণা (Basic Concept) হচ্ছে, সমাজে বিদ্যমান উৎপাদনহীন বা উৎপাদন-বিমুখ ব্যাপক জনগোষ্ঠী (বিশেষত নারী সমাজ) প্রণোদিত হলে দেশের উৎপাদনশীলতায় একটি অভূতপূর্ব গতিশীলতা সৃষ্টি হবে, তাদের মধ্যে আত্ম-উন্নয়ন, অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন ব্যবস্থা ও জীবন-যুদ্ধে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য নেবে, বর্ধিষ্ণু হারে শ্রমবাজারে শ্রমশক্তির সমাবেশ ঘটবে, সমাজে বর্ধিষ্ণু মাত্রায় কর্মসংস্থানের বৈচিত্র্য আসবে, তাদের আর্থ-সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে, এবং ফলে বর্ধিষ্ণু হারে দারিদ্র্য বিমোচন ঘটবে।

সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের প্রস্তাবিত সিস্টেমস এ্যাপ্রোচটি কোন অনমনীয় (rigid) পদ্ধতি নয়, বরং তা প্রয়োজনীয় মাত্রায় স্থিতিস্থাপক (flexible)। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী এবং তাদের স্তরিক অবস্থাভেদে তাদের বিদ্যমান জেভার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত দৃষ্টিকোণে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি, গ্রামীণ-শহুরে এবং জাতি-শ্রেণী হিসেবে সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতি (cultural majority), উপ-জাতি (cultural minority) ও সমাজের নির্বাক

জনগোষ্ঠী (outcast) যেমন মুচি, মেথর, নাপিত, জেলে, তাঁতী, কুমার ইত্যাদি সম্প্রদায়ে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণে তাদেরকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র বা অন্যান্য বিভিন্ন পেশাজীবী এবং নারী-পুরুষ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। শিক্ষার পর্যায় বা ধনী-দরিদ্রের পর্যায়ের আলোকে তাদেরকে শ্রেণী-দলে স্তরায়ন করা যায়। আবার সামাজিক অবস্থানের আঙ্গিকে তাদেরকে নীতি প্রণেতা বা পরিকল্পনাকারী, নীতি-পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী এবং আম-জনতা বা উপকারভোগী এ তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। এ সকল স্তরিক ভিন্নতার কারণে তাদের বিদ্যমান জেডার দৃষ্টিভঙ্গিতেও ভিন্নতা দেখা যায়। একারণে জেডার মূল্যবোধের সামাজিক প্রকৌশলয়নে প্রথমে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্ধারণ করে তাদের বিদ্যমান জেডার দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপণ করা হবে এবং সে আঙ্গিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়নের নিমিত্তে তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপিত হবে।

তৃতীয় পর্যায়ের কাজ হলো নিরূপিত প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে স্তরভিত্তিক প্রশিক্ষণ ডিজাইন বা নকশায়ন এবং জেডার প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ। তবে একথা স্মার্তব্য যে, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্তর বিভাজন, স্তরভিত্তিক জেডার দৃষ্টিভঙ্গি ও জেডার প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণ ডিজাইন বা নকশায়ন এবং জেডার প্রশিক্ষণ প্রদানে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি সকল কাজই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে। স্তরভিত্তিক প্রশিক্ষণ নকশায়নে “কৌষ্ঠিক পদ্ধতি” (modular approach) অনুসৃত হবে এবং তা “পূর্ণ-মোড়ক” (full-package) আকারে নকশায়িত হবে। তবে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে “পূর্ণ-মোড়ক” বা পর্যায়ক্রমিক (step by step) পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে। প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষক এ দু’ধরনের জনবলের প্রয়োজন হয়। চিহ্নিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দু’ধরনের জনবলই থাকা অত্যাাবশ্যক নয়, তবে প্রথমোক্ত শ্রেণীর জনবল এবং প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সহায়ক সরঞ্জামের বিদ্যমানতার আবশ্যকতা রয়েছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জনবলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের একটি পুল থাকতে হবে, যাতে চিহ্নিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনে সহজে পুলভুক্ত এ জনবলকে ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। জেডার প্রশিক্ষণ পরিচালনায় চিহ্নিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উপযুক্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি, মাঠ-পর্যায়ে কর্মরত এনজিও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক নকশায়িত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম, কারিকুলাম ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং অবস্থা ভেদে সময়ে-সময়ে এগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংশোধন ও সমন্বয়পযোগীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানে একটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে হবে। সামগ্রিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা অনুরূপ কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হতে পারে। চিহ্নিত কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান মাঠ-পর্যায়ের ফলাবর্তন-তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

চতুর্থ পর্যায়ের কাজ হলো জেভার প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। এক্ষেত্রে স্মার্তব্য যে, আমাদের দেশের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, উদ্দিষ্ট উপকারভোগী সংস্থা ও সামাজিক সংগঠনগুলো মূলত পিতৃতান্ত্রিক আদর্শে লালিত এবং এখানে অনুসৃত কার্যক্রম পদ্ধতিসমূহে উপর্যুক্ত আদর্শই অনুশীলিত হয়ে থাকে। সুতরাং জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নে “নারীর অগ্রসরায়নে জাতীয় নীতিমালা” (National Policy for Advancement of Women), “জাতীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা” (National Action Plan) ও জীবনের সর্ব পরিসরে জেভার সমতায়ন, জেভার মূলস্রোতধারায়ন, জেভার উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সরকারের নীতি সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনগুলোর আদর্শ ও অনুশীলনে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে হবে। এজন্য এ সকল প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনগুলোর ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধিকারী মন্ত্রণালয় বা সংস্থা কর্তৃক অবশ্য পালনীয় সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকা অত্যাবশ্যিক। জেভার প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক প্রণীত জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালায় বর্ণিত প্রশিক্ষণ বাজেট সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর আলোকে নির্ধারিত বরাদ্দ থেকে এ জাতীয় প্রশিক্ষণের ব্যয়-নির্বাহে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

প্রক্রিয়াগত দিক থেকে জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নে “উপদেশনা ও প্রণোদনামূলক অনুশীলন প্রশিক্ষণ” পদ্ধতি অনুসৃত হবে। জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের বর্ণিত মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত প্রশিক্ষণটি হবে উৎপাদ (output) ও অর্জিত উৎপাদের কাঙ্ক্ষিত পরিণতি (outcome) কেন্দ্রিক। তবে জেভার মূল্যবোধের কাম্য সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :

- বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরে বিদ্যমান জেভার দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা কমিয়ে আনার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে এ এ্যাপ্রোচটিতে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জেভার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষাপট (attitudes and background) বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটি সমসত্ত্ব (homogeneous) দলভিত্তিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- এ এ্যাপ্রোচটিতে নিরূপিত স্তরভিত্তিক জেভার প্রশিক্ষণ চাহিদা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দ্বন্দ্বের আলোকে অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে জেভার ধারণা, বিদ্যমান জেভার মূল্যবোধ ও তার আর্থ-সামাজিক পরিণতি এবং সামাজিক সংগঠনসমূহে বিদ্যমান আদর্শ, অনুশীলন, কাঠামো ও সম্পদের বন্টন এবং তার আর্থ-সামাজিক পরিণতি ইত্যাদি সম্পর্কে পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ করতে হবে এবং একই সাথে জেভার মূলস্রোতধারায়ন ও “উন্নয়নে নারী” নীতিমালার আলোকে জেভার বিষয়ক নীতিমালা ও সামাজিক বিষয়াবলী পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নের কৌশল খোঁজা হবে। এভাবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জেভার-সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে তারা যাতে দ্বন্দ্বিক সামাজিক প্রচলনকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি অর্জন করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

- প্রদেয় প্রশিক্ষণে নীতি প্রণেতা বা পরিকল্পনাকারী, নীতি-পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী এবং আম-জনতা বা উপকারভোগী এ সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তবে, প্রাথমিক পর্যায়ে স্তরভিত্তিক পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিদ্যমান জেভার দৃষ্টিভঙ্গিগত শূন্যতা বা বৈষম্য কমে এলে এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার মোটামুটি একটা সমসত্ত্বতা বিরাজ করলে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের জন্য একত্রে সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের স্তর ও প্রেক্ষাপটের নিরিখে তাদের ধারণ ক্ষমতার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন ও মিডিয়ার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত ও কর্ম-অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থানের বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে সেটি কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করতে হবে। এখানে শ্রেণী, বর্ণ ও ধর্ম জেভার বৈষম্য সৃষ্টিতে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এরপর বিশ্লেষণের ফলাফলের আলোকে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং এগুলো বাস্তব জীবনে তারা কিভাবে অনুসরণ করবে তার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগত দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।
- এ্যাথ্রোচটিতে জীবনের সর্ব পরিসরে নারীর বাস্তবমুখী ও কৌশলগত জেভার চাহিদা এবং নারীর বঞ্চনা ও পশ্চাৎপদতা বিবেচনায় তার প্রজনন ও উৎপাদনশীল উভয় ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং বিদ্যমান জেভার বৈষম্য দূরীকরণসহ তাদের কৌশলগত জেভার চাহিদা পূরণের প্রয়াস নেয়া হবে, যাতে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের মাধ্যমে অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গিগত ও প্রত্যাশিত বাস্তব পরিবর্তন যেন তাদের মধ্যে চেতনাগত শক্তির উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়।
- নারীর বাস্তবমুখী ও কৌশলগত চাহিদা পূরণের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে সেগুলো উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে স্থান-কাল ও পরিস্থিতির ভিন্নতাকে বিবেচনায় নেয়া হবে।
- জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন প্রাতিষ্ঠানিক ও জেভার উভয় প্রকৃতির উন্নয়নের দৃষ্টিকোণে পরিচালিত হবে। ফলে তা একদিকে যেমন সংস্থার কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করবে, অন্যদিকে তা নারীর ভিন্নতর স্বার্থ ও চাহিদা বিবেচনা করে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ফলপ্রসূ পরিকল্পনা ও সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধিসহ সংস্থার মধ্যে বিদ্যমান জেভার-ক্ষমতা-সম্পর্কের (Gender Power Relations) কাজিষ্ঠত পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হবে।
- নারীর পশ্চাৎপদতার বিষয়টি সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উন্নয়ন সুবিধার অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি এখানে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

- জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে সমাজের সকল স্তরের জন্য প্রযোজ্য হলেও দারিদ্র্য বিমোচনের দৃষ্টিকোণে উৎপাদনহীন বা উৎপাদন-বিমুখ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কিভাবে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণে বিবেচ্য উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারবে এবং অর্জিত উন্নয়ন ও উৎপাদনের অংশিদারিত্ব অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে তারা পর্যায়ক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি-ভিত্তিতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করতে পারবে, সে বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে।

সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবিত পুনঃপ্রকৌশলায়ন পদ্ধতিটি কোন এক-মারী (one-shot) প্রয়াস নয়। বিদ্যমান পেন্সাপটে প্রাথমিক পর্যায়ের পুনঃপ্রকৌশলায়ন প্রক্রিয়ায় জেভার বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া বা পরিণতির আলোকে জেভার সচেতনতা সৃষ্টি, জেভার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি ও জেভার অন্ধত্ব নিরসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যথার্থ জেভার সংবেদনশীলতা অর্জিত হলে পরবর্তী পর্যায়ে জেভার সমতায়ন, মূলস্রোতধারায়ন ও ক্ষমতায়নের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের নিমিত্তে নকশায়িত প্রশিক্ষণ কারিকুলামেও পর্যায়ক্রমিকভাবে আঙ্গিক পরিবর্তন আনতে হবে। পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার (change management) দৃষ্টিকোণে সামগ্রিক প্রশিক্ষণ চক্রের (training cycle) ব্যবস্থাপনায়ও উপযুক্ত পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন কিভাবে বিদ্যমান উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করবে এবং কি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় “অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা” (absolute productivity) ও “আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতা” (relative productivity) উভয় পদ্ধতিতে সম্পাদিত হতে পারে। আর উৎপাদনশীলতার অংশিদারিত্বের কারণে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলাফল হিসেবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ঘটবে।

২.২.৩ উৎপাদ/কর্মদক্ষতা পদ্ধতিসমূহ

ধারণাগত দিক থেকে অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা হচ্ছে, একজন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে জড়িত থাকার ফলে যে উৎপাদনশীলতা অর্জন করছে তার পরিমাণ। আর আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতা হচ্ছে, উৎপাদনশীলতার ব্যাকওয়ার্ড-লিঙ্কেজ প্রদানের মাধ্যমে একজন মানুষ অর্জিত প্রকৃত উৎপাদনশীলতায় যে অবদান রাখছে তার পরিমাণ। উদাহরণত একজন কৃষক তার নিজের জমি চাষ করলে বা নিজের জমিতে কাজ করলে তাকে কোন শ্রমমূল্য দিতে হয় না। কিন্তু তার এই শ্রমের একটি নির্দিষ্ট সম্ভরণ মূল্য রয়েছে, যা অর্থনীতির বিচারে তার উৎপাদন মূল্যে সংযোজিত হয় এবং লাভ-ক্ষতির হিসেবে তা উৎপাদ মূল্যে বিবেচিত হয়। একজন নারীর প্রজনন দায়িত্ব সম্ভরণ, উৎপাদন ও উৎপাদ কোন স্তরেই অর্থনৈতিক মূল্যমানে বিবেচিত হয়না। অথচ নারীর সুষ্ঠু প্রজনন

দায়িত্ব পালনের ওপর অর্থনীতির বিচারে অর্জিত দেশের উৎপাদনশীলতা দারুণভাবে নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে উপযুক্ত কৃষককে যথার্থ কর্মক্ষম রাখার জন্য তার খাদ্যোৎপাদন, প্রয়োজনীয় পুষ্টির সরবরাহ নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্প্রসারণ, উৎপাদনে কৃষকের মনোনিবেশ করার উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি ও পারিবারিক নানাবিধ ঝুট-বামেলা ক্ষক্ষে নেয়া যেমন, সন্তানের লালন-পালন, তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ ইত্যাদি এবং পারিবারিক পর্যায়ে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা যেমন, মাড়াই, শুকানো, অন্যান্য উপায়ে উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রজনন দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। নারীর এই প্রজনন দায়িত্বেরও একটি অর্থনৈতিক সম্ভরণ মূল্য আছে, যা আপাতত সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃতি না হলেও কার্যত ক্রিয়াশীল। সুতরাং প্রকৃত অর্থে দেশের উৎপাদনশীলতার পরিমাণ নিরূপণে নারীর প্রজনন দায়িত্বের অবদান অবশ্যই বিবেচ্য। উৎপাদনশীলতার গাণিতিক পরিমাপে নারীর এই প্রজনন দায়িত্বের অবদানের অন্তর্ভুক্তি একদিকে যেমন জেভার-বিভাজিত বিদ্যমান উৎপাদনশীলতার চিত্রকে পাল্টে দেবে, অন্যদিকে তাতে নারীর বিদ্যমান ভূমিকার উৎপাদন-অবদান আর্থ-সামাজিক স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হবে, যা জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নকে আরো ত্বরান্বিত করবে এবং অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা অর্জনে নারীর বর্ধিষ্ণু অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে।

বর্ণিত সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন পদ্ধতি উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতিতে বর্ণিত সম্ভরণ সেবা, সম্পদ ও সুবিধাদিতে নারীর প্রবেশাধিকারকে বর্ধিষ্ণু মাত্রায় সম্প্রসারিত ও উন্মুক্ত করবে। এতে তাদের সক্ষমতা, দক্ষতা-যোগ্যতার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাস ঘটবে। ফলে সেবা, সম্পদ ও সুবিধাদিতে নারীর বর্ধিষ্ণু প্রবেশাধিকার আরো ত্বরান্বিত হবে, আপন দক্ষতা-যোগ্যতায় নারী সমাজে তার বিদ্যমান অবস্থান ও ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি অর্জন করবে এবং অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতায় নারীর বর্ধিষ্ণু অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হাতে-হাত, কাধে-কাধ মিলিয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভারাক্রান্ত জনসংখ্যা বর্ধিত জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় একটি ইতিবাচক, বর্ধিষ্ণু ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে, যা প্রকারান্তরে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা অর্জন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে একটি অভূতপূর্ব ও অপরিমেয় গতিশীলতার সৃষ্টি করবে। তবে সমস্যা হচ্ছে, উদাহরণে বর্ণিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মত নারীর আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতা আপাত দৃশ্যমান নয় বা পরিমাপ করা হয়না। কিন্তু গাণিতিক কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে এ উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা যায়। এক্ষেত্রে একজন নারীর প্রকৃত উৎপাদনশীলতা হচ্ছে :

$$W_{pj} = WA_{pj} P + WR_{pj} + WA_{pj} C \dots \dots \dots [সূত্র - ১]$$

এখানে, W = নারী/মহিলা বা woman, p = উৎপাদনশীলতা বা productivity, A = অনপেক্ষ বা Absolute, P = বর্তমান/বিদ্যমান বা Present, C = সৃষ্টি বা Created,

R = আপেক্ষিক বা Relative এবং 'j' = একজন নির্দিষ্ট নারী/মহিলা 'j' এর সংশ্লিষ্ট উপাত্তের নির্দেশক হিসেবে প্রতিপাদিত হয়েছে, যেখানে :

W_{pj} = একজন নারী 'j' এর নির্ণীত প্রকৃত উৎপাদনশীলতা;

$WA_{pj}P$ = বিদ্যমান পরিসরে উক্ত 'j' নারীর অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা;

WR_{pj} = উক্ত 'j' নারীর আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতা এবং

$WA_{pj}C$ = সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট উক্ত 'j' নারীর অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা।

সামগ্রিকভাবে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট নারীর অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা দু'টি ভিন্ন আঙ্গিকে বৃদ্ধি ঘটবে। প্রথমত অর্থনীতির বিচারে বিবেচিত উৎপাদনশীল কার্যক্রমে উৎপাদন-বিমুখ বা উৎপাদনহীন নারীর অন্তর্ভুক্তি শ্রম-বাজারে বর্ধিত শ্রমিকের সমাবেশ ঘটাবে। ফলে শ্রম-বাজারে বর্ধিত সংখ্যক নারী-শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি নারীর বর্ধিত অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করবে। দ্বিতীয়ত সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের কারণে নারীর কর্মক্ষমতা, কর্ম-দক্ষতা ও উৎপাদন শৈল্পিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, অনপেক্ষ উৎপাদনে বর্ধিষ্ণু সংশ্লিষ্টতার কারণে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি হবে, পারিবারিক পর্যায়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটবে, উৎপাদনে পুঁজি সঞ্চালনের হার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যাবে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এতে একদিকে যেমন সম্পদ, সেবা ও সুবিধাদিতে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের কারণে বর্তমানে উৎপাদনশীল কার্যক্রমে নিয়োজিত নারীর কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে শ্রম-বাজারে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত নারী-শ্রমিক নতুন অবয়বে নতুন প্রজন্মের কর্ম-দক্ষতায় (new generation performance) উদ্ভাসিত হবে, যা তার উৎপাদনশীলতায় একটি নতুন মাত্রার গতিশীলতা সৃষ্টি করবে। এভাবে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সৃষ্ট নারীর অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতাকে নিম্নরূপে পরিমাপ করা যাবে :

$$WA_{pj}C = WA_{pj}C_iL + WA_{pj}C_iE \dots \dots \dots [সূত্র - ১/১]$$

এখানে, i = বর্ধিত বা increased, L = শ্রমশক্তি বা Labor Force এবং E = কর্ম-দক্ষতা/সক্ষমতা বা Efficiency/Performance হিসেবে প্রতিপাদিত হয়েছে, যেখানে :

$WA_{pj}C$ = সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট নারীর অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা;

$WA_{pj}C_iL$ = সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট উৎপাদন-বিমুখ বা উৎপাদনহীন বর্ধিত নারী-শ্রমিকের অর্জিত অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা;

WA_pC_iE = সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন প্রজন্মের কর্ম-দক্ষতার কারণে (উৎপাদনশীল কার্যক্রমে বর্তমানে নিয়োজিত + নতুনভাবে আগত) নারীর বর্ধিত অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা;

এভাবে নারীর প্রকৃত উৎপাদনশীলতা পরিমাপের পর নিম্নোক্ত সূত্রের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত বর্ধিত উৎপাদনশীলতা নিরূপিত হতে পারে :

$$W_{ip} = W_p - WA_pP \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad [সূত্র - ২]$$

এখানে, W_{ip} = নারীর প্রকৃত বর্ধিত উৎপাদনশীলতা;

W_p = নারীর নির্ণীত প্রকৃত উৎপাদনশীলতা; এবং

WA_pP = বিদ্যমান পরিসরে নারীর অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা।

তবে গাণিতিক পরিসরে তাত্ত্বিকভাবে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট নারীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টি যতটা সহজভাবে কার্যকর মনে হচ্ছে, বাস্তব পরিসরে সেটাকে ততটা সহজ-সাধ্য ভাবার অবকাশ নেই। বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব বা ছায়া-বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে খুবই উচ্চ। শ্রম-বাজারে নতুন আঙ্গিকে ব্যাপক পরিসরে নারী-শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি বেকারত্বের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আরো নাজুক করে তুলতে পারে। উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতিসমূহে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন পদ্ধতির মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদ্ভূত এ পরিস্থিতির অনেকটাই সামাল দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু তবুও পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখে কাম্য উৎপাদনশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন পদ্ধতি ও উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতিসমূহে স্তরায়িত জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট স্তর-উপযুক্ত কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির পৃথক নীতি-পদক্ষেপ নিতে হবে। উদাহরণত সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের সাথে উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতিসমূহের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া সম্ভরণ পদ্ধতি হিসেবে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর জন্য একই হারে কার্যকর হবে না। অন্ধ, বিকলাঙ্গ, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বিভিন্ন উপ-জাতিগোষ্ঠী বা বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় অথবা অন্য কোন অবহেলিত জনগোষ্ঠীতে এ পদ্ধতির কাম্য কার্যকারিতা পেতে হলে তাদের উপযুক্ত পৃথক নীতি-পদক্ষেপ ও নীতি-প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী ও সামাজিক নিরাপত্তা সিঁড়ি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে।

আবার সামগ্রিকভাবে এ প্রক্রিয়া একদিকে যেমন সম্পদ, সেবা ও সুবিধাদিতে নারীর প্রবেশাধিকারকে পুনর্বিন্যস্ত করবে, অন্যদিকে তা পুরুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে পুনর্বিন্যস্ত করবে এবং প্রজনন দায়িত্বে তাদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করবে। সেক্ষেত্রে নারীর মত পুরুষের উৎপাদনশীলতাও অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতায় বিভাজিত হবে। সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা পরিমাপে নতুন আঙ্গিকে সৃষ্ট পুরুষের এই আপেক্ষিক

উৎপাদনশীলতাও বিবেচনায় আনতে হবে। এভাবে একটি পরিবারের কর্মক্ষম পুরুষ ও নারীর অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতার যোগফল ঐ পরিবারের মোট উৎপাদনশীলতা এবং জাতীয় পর্যায়ে কর্মক্ষম সকল পুরুষ ও নারীর অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতার যোগফল মোট জাতীয় উৎপাদনশীলতা হিসেবে গণ্য করা হবে। মোট জাতীয় উৎপাদনশীলতা নিম্নোক্ত গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যাবে :

$$TN_p = \{(MA_pP + MR_p + MA_pE) + (WA_pP + WR_pC + WA_pE)\}$$

... .. [সূত্র - ৩]

অনুরূপভাবে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে একটি পরিবারের মোট পারিবারিক উৎপাদনশীলতাও নিরূপিত হতে পারে। যাহোক, উপর্যুক্ত সূত্রে T = মোট বা Total, N = জাতীয় বা National, TN = মোট জাতীয় বা Total National এবং M = পুরুষ বা Male হিসেবে প্রতিপাদিত হয়েছে। সুতরাং মোট জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করার পর নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা নিরূপিত হতে পারে :

$$N_{ip} = TN_p - (MA_pP + WA_pP) \quad \dots \dots \dots [সূত্র - ৪]$$

এখানে, N_{ip} = বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা;

TN_p = নির্ণীত মোট জাতীয় উৎপাদনশীলতা;

MA_pP = বিদ্যমান পরিসরে পুরুষের অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা; এবং

WA_pP = বিদ্যমান পরিসরে নারীর অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা।

এভাবে নির্ণীত মোট বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনশীলতাকে মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যা দ্বারা বিভাজন করে বিভাজিত ফলাফলকে শতাংশে প্রকাশের মাধ্যমে বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনশীলতার হার নিরূপিত হতে পারে। সামগ্রিকভাবে জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের বর্ধিত এ পদ্ধতিটি নারীর বা জাতীয় উৎপাদনশীলতাই শুধু বৃদ্ধি করবে তা নয়। বরং বর্ধিত ও জাতীয় উৎপাদনশীলতায় নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে, উৎপাদনশীলতার জেডার-বিভাজিত তথ্য পাওয়া যাবে এবং সমাজে একটি নতুন মাত্রার উৎপাদনশীলতার গতিশীলতা সৃষ্টি হবে। ফলে নারী উন্নয়ন, জেডার-মূলস্রোতধারায়ন, সমতায়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর লাগসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ-সাধ্য হয়ে উঠবে এবং সামগ্রিকভাবে তা দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

২.২.৪ দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতিসমূহ

স্বাধীনতান্ত্রের কাল থেকে বাংলাদেশের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিটি পরিকল্পনায়ই দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে প্রতিটি সরকারই নানামুখী কার্যক্রম

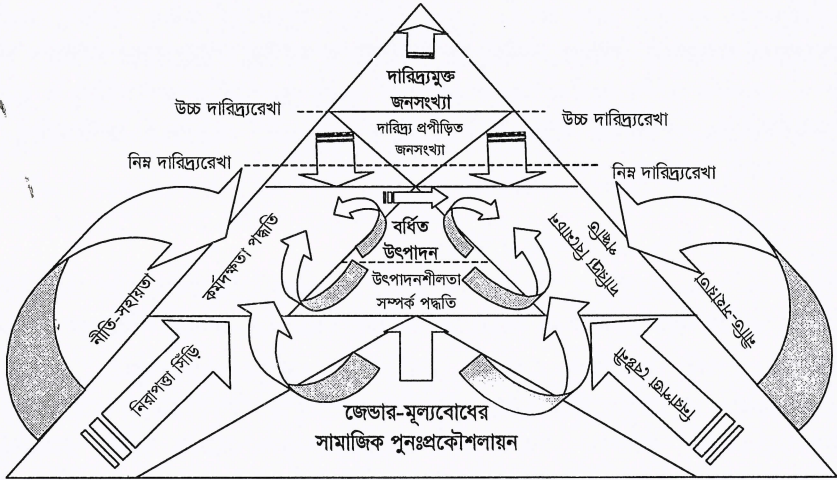
হাতে নিয়েছে। দীর্ঘ তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে দারিদ্র্য বিমোচনের এই অব্যাহত প্রয়াসে অনেকটা সফলতাও এসেছে, আগের তুলনায় বাংলাদেশের দারিদ্র্যাবস্থার উন্নতিও ঘটেছে। কিন্তু তারপরও দারিদ্র্য বিমোচনের বিদ্যমান হার প্রত্যাশানুরূপ নয়। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে সফল করার জন্য সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও সরকার অনেকগুলো “সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী” ও “সামাজিক নিরাপত্তা সিঁড়ি” কর্মসূচি নিয়েছে [সংযোজনী-১]। বিভিন্ন এনজিও, সামাজিক সংগঠন এমনকি ব্যক্তি উদ্যোগেও অনেক সময় এ জাতীয় কর্মসূচি গৃহীত বা পরিচালিত হয়ে থাকে। ব্যক্তি উদ্যোগে গৃহীত বা পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে এতিমখানা পরিচালনা দুর্যোগকালীন ত্রাণ বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, যাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি বা আর্থিক সহায়তা প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা, পেশাজীবী প্রশিক্ষণ, ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা (education for dropout children) ইত্যাদি অন্যতম। দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত এ কর্মসূচিগুলোকে বর্তমান সমীক্ষায় “সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী” ও “নিরাপত্তা সিঁড়ি” হিসেবে বিভাজন করা হলেও [সংযোজনী-১] প্রকৃতিগত দিক থেকে অনেকগুলো কর্মসূচিতে উল্লিখিত দু’ধরনের বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণত, ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি প্রধানত একটি “সামাজিক নিরাপত্তা সিঁড়ি” কর্মসূচি হলেও এটি সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী হিসেবেও কার্যকর। এ কর্মসূচিটি একদিকে যেমন একটি দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র্যাবস্থার অবনতির বিপরীতে রক্ষা-কবচ হিসেবে কাজ করে, অন্যদিকে কৌশলগত দিক থেকে তা তাদের দারিদ্র্যাবস্থা উত্তরণের সিঁড়ি হিসেবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু VGF বা বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি সর্বাংশে সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী ও নিরাপত্তা সিঁড়ি হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত এ সকল কর্মসূচির অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তবে কর্মসূচিগুলোর কিছু সহজাত (inherent) দুর্বলতার কারণে দারিদ্র্য বিমোচনে তা প্রত্যাশানুরূপ সফলতা আনয়নে সক্ষম হয়নি। প্রথমত কর্মসূচিগুলো যথার্থ জেভার-সংবেদনশীল নয়। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা জেভার সমতায়ন, ক্ষমতায়ন ও মূলস্রোতধারায়ন অপেক্ষা মূলত উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উদ্বর্তনের (survival) লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এতে “দারিদ্র্য-বাণিজ্যে” সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের ঘরে “লক্ষ্মী” এলেও দারিদ্র্য প্রপীড়িত জনগোষ্ঠীর “কঙ্কালসার বেঁচে থাকা” ছাড়া তাদের কাম্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়না। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন এনজিও, সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তি উদ্যোগের বিষয়টি বাদ দিলেও সরকারি পর্যায়েই অসংখ্য সংস্থা, দপ্তর ও মন্ত্রণালয় এ জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণে জড়িত এবং এ সকল কর্মসূচির সৃষ্ট বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত নীতিমালার অভাবে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়হীনতা অত্যন্ত প্রকট। ফলে কর্মসূচিগুলো একদিকে যেমন স্থানীয় পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রাবরিত (overlapped), বাস্তব পরিসরে উদ্দিষ্ট স্তরিক সমাজ-গোষ্ঠীর প্রকৃত ঝুঁকি-চিত্র অননুসৃত, অন্যদিকে কর্মসূচিগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (institutionalization) সম্ভব হয়নি বিধায় সরকার পরিবর্তনে এগুলোর প্রকৃতি, পরিসর, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন রূপরেখা পরিবর্তিত হয়। তৃতীয়ত প্রয়োজনের তুলনায় কর্মসূচিগুলোর ব্যাপ্তি খুবই সীমিত, আর্থিক পরিমাণের দিক থেকে খুবই অপরিপূর্ণ এবং বাস্তবত এগুলোর প্রশাসনিক ব্যয় ও লিকেজ বা সিস্টেম-লস খুব বেশি (The Government of the People’s Republic of Bangladesh, 2005,

pp. 123-124)। চতুর্থতম কর্মসূচিগুলো মূলত গ্রামীণ দারিদ্র্য — আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ভূমি-মালিকানা ও আয়-দারিদ্র্য কেন্দ্রিক। কিন্তু উত্তর বঙ্গের মঙ্গা পীড়িত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের প্রকৃতি এবং উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের নদী-ভাঙ্গনের কবলে নিপতিত জনগোষ্ঠী বা নিম্ন ও মধ্যাঞ্চলের বান-ভাসী মানুষের বা বৈরি প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত তাগুবে ও পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণে উদ্ভূত উত্তর, মধ্য ও নিম্নাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্যের প্রকৃতি এক নয়। আর্সেনিক দূষণ বা দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট দারিদ্র্যের প্রকৃতিতে ভিন্নতা দেখা যায়। আবার উপ-জাতি-গোষ্ঠী, সমাজের নির্বাক (outcast) জনগোষ্ঠী যেমন মুচি, মেথর, নাপিত, জেলে, তাঁতী, কুমার ইত্যাদি বা অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও ক্লান্তসমূহ সামাজিক স্তরভেদে ও ভৌগোলিক পরিসরে সকল ক্ষেত্রে এক নয়। এজন্য সরকার বা অন্যান্য সামাজিক সংগঠন ও এনজিও কর্তৃক গৃহীত একক কোন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি তাদের সকলের জন্য একই হারে কার্যকর নয়। বরং বলা যায়, এ সকল কর্মসূচি তাদের অনেককে স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। পঞ্চমত মুদ্রাশ্রীতি বা বৈশ্বিক পরিসরে উন্নয়ন নীতিমালার পরিবর্তন যেমন বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি ইত্যাদির প্রচলন উপর্যুক্ত জনগোষ্ঠীতে ভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের জন্ম দেয়। ষষ্ঠতম কর্ম-পরিসরে বিদ্যমান নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক পরিবেশ শ্রম-বাজারে অপেক্ষ উৎপাদনশীলতায় বর্ষিষ্ণু হারে নারীর অন্তর্ভুক্তিকে নিরুৎসাহিত করে। সপ্তমত মানুষের দারিদ্র্য শুধু ভূমি-মালিকানা বা আয়-বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বয়স ও জেভার ভেদে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য-দারিদ্র্য, খাদ্য/পুষ্টি গ্রহণ, খাদ্য নিরাপত্তা, ভোগ-ব্যয় (consumption expenditure), পুরুষহীন পরিবারে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং সামগ্রিকভাবে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবলী নারী মানব দারিদ্র্যকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনে বিদ্যমান ধারার সাধারণ কৌশলসমূহ এ সকল সমস্যা সম্বোধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। এ কারণে এ সকল সমস্যা উত্তরণে বিকল্প ধারার উপযুক্ত কৌশল অনুসরণ অত্যাৱশ্যক। জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

জেভার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়নের মোড়ক প্রস্তাবনাটি সামগ্রিকভাবে উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতি ও তার সম্ভরণ ফ্যাক্টরসমূহ এবং কর্মদক্ষতা পদ্ধতির ওপর কিভাবে কাজ করে এবং এ প্রক্রিয়া উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের ওপর কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম তা ইতোপূর্বে বিদ্যুত হয়েছে। সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়নের দারিদ্র্য বিমোচন পিরামিড (চিত্র-২) জেভার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতি, কর্মদক্ষতা পদ্ধতি এবং দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতির বহুমাত্রিক ও যৌগিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্যভাবে চিত্রায়িত করে। প্রক্রিয়াগত দিক থেকে জেভার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন দারিদ্র্য বিমোচনে স্বয়ংক্রিয় সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী ও সামাজিক নিরাপত্তা সিঁড়ি হিসেবে কাজ করে। একই সাথে তা দারিদ্র্য বিমোচন, জেভার সমতায়ন, ক্ষমতায়ন ও মূলস্রোতধারায়নের চেতনাগত চালিকাশক্তি সম্পন্ন সম্ভরণ ফ্যাক্টর হিসেবেও কাজ করে। এ প্রক্রিয়া দারিদ্র্য বিমোচনের

বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেঁটনী ও নিরাপত্তা সিঁড়ি কর্মসূচিকে অধিকতর গতিশীল করবে এবং স্তরিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা-কেন্দ্রিক হওয়ায় এ প্রক্রিয়া সময়ের প্রেক্ষাপটে ও বাস্তব চাহিদার আলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্তরিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে উপযুক্ত নতুন মাত্রার সামাজিক নিরাপত্তা বেঁটনী ও নিরাপত্তা সিঁড়ি কর্মসূচি চিহ্নিতকরণ, সৃষ্টি ও উদ্ভাবন এবং উপযুক্ত অবয়বে সেগুলো অবলম্বনের ক্ষমতা যোগাবে। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে তা একাধারে উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতি, কর্মদক্ষতা পদ্ধতি ও দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতির ওপর পৃথক পৃথকভাবে ত্রিমুখী ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে।

আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে এ প্রক্রিয়া উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতি, কর্মদক্ষতা পদ্ধতি ও দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতির মধ্যে ভিন্ন মাত্রার যোগসূত্র স্থাপন করবে। এতে একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্তরিক পরিসরে উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতির সম্ভরণ ফ্যাক্টরসমূহের উন্নয়ন উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতি ও কর্মদক্ষতা পদ্ধতির মধ্যে দ্বিমুখী মিথস্ক্রিয় সম্পর্কের সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট স্তরিক জনগোষ্ঠীর বর্ধিত উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতির সম্ভরণ ফ্যাক্টরসমূহের উন্নয়ন ও অর্জিত বর্ধিত কর্মদক্ষতা দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতির ওপর বর্ধিষ্ণু মাত্রায় ইতিবাচকভাবে ক্রিয়াশীল হবে।



চিত্র-২ : সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়নের দারিদ্র্য বিমোচন পিরামিড

তৃতীয় পর্যায়ে এ প্রক্রিয়া সমাজের বিভিন্ন শক্তি-ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার উন্মোচনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, তাদের আয়-দারিদ্র্য ও ক্যালোরী-গ্রহণ দারিদ্র্য হ্রাস করবে এবং নিম্ন-দারিদ্র্যরেখা বা চরম দারিদ্র্যরেখা ও উচ্চ-দারিদ্র্যরেখা ক্রমশ নিম্নগামী হবে। অর্থাৎ দারিদ্র্য প্রপীড়িত জনসংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকবে এবং তারা দারিদ্র্যমুক্ত জনগোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গৃহীত নীতি-সহায়তা এ প্রক্রিয়াকে

আরো ত্বরান্বিত করবে। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে এ প্রক্রিয়ার বর্ণিত প্রভাব পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হবে এবং কোন নির্দিষ্ট স্তরাভ্যন্তরীণ ও আন্তঃস্তরিক জনগোষ্ঠীতে বিকীরিত (diffused) হবে। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে এ প্রক্রিয়া পিরামিডীয় পদ্ধতি অনুসরণ করবে। অর্থাৎ কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে এ প্রক্রিয়া বিপরীতমুখী পিরামিডীয় পদ্ধতি অনুসরণ করবে। অর্থাৎ দারিদ্র্যের পশ্চাদপসরণ ঘটবে এবং জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির মালথুসীয় পদ্ধতির মত লগারিদমিক হারে^{১৭} দারিদ্র্য বিমোচন ঘটবে। এভাবে এক সময় চরম দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থিত দারিদ্র্য প্রপীড়িত জনসংখ্যা প্রায় শূন্যের কোটায় এসে ঠেকবে। তবে উচ্চ দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থিত দারিদ্র্য প্রপীড়িত জনসংখ্যা কমতে কমতে একটি অগুরুত্বপূর্ণ পরিমাণে (insignificant proportion) স্থির থাকবে^{১৮} এবং এভাবে দেশ একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিগণিত হবে।

জেডার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট দারিদ্র্যাবস্থার এ উন্নতিকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। বিশ্বব্যাংক অনুসৃত পদ্ধতি (The World Bank and Asian Development Bank, 2003, pp. 92-94) অনুসরণে নিম্ন ও উচ্চ দারিদ্র্যরেখা নিরূপণ করে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের কারণে সৃষ্ট পরিবর্তিত দারিদ্র্যাবস্থা পরিমাপ করা যাবে। দেশে বিদ্যমান ইতোপূর্বে বর্ণিত অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমেও পরিবার, বিভিন্ন শ্রেণী-গোষ্ঠী ও জাতীয় দারিদ্র্যাবস্থা পরিমাপ করা যাবে। এমনকি বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনশীলতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব ও প্রকৃত ভোগাধিকারের পরিমাণও পরিমাপ করা সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনে অংশীদারিত্ব ও ভোগাধিকার উন্নয়নের পৃথক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে।

৩.০ সুপারিশ, নীতি-পরামর্শসমূহ ও উপসংহার

বর্তমান সমীক্ষায় অবতারণিত “জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন তত্ত্ব” মূলত বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিকল্প পরিবেশনা পদ্ধতি সম্বলিত একটি বহুমাত্রিক মোড়ক প্রস্তাবনা (multidimensional package proposal), যা জেডার মূল্যবোধের সাথে উৎপাদনশীলতা সম্পর্ক পদ্ধতি ও তার সম্ভরণ উপ-পদ্ধতিসমূহ, কর্মদক্ষতা পদ্ধতি এবং দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতির গ্রন্থিল যোগসূত্রকে প্রতিপাদন করে। প্রস্তাবনাটি দারিদ্র্য বিমোচনের বিদ্যমান কৌশলসমূহের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না বা বিদ্যমান দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলসমূহের সাথে প্রস্তাবনাটির কোন

^{১৭} লগারিদমিক হার বলতে একটি সুনির্দিষ্ট কালিক বিরতিতে প্রদত্ত/উদ্ভূত আনুপাতিক/সমানুপাতিক হারকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি হারে এ পরিবর্তন (দারিদ্র্য বিমোচন) সংঘটিত হবে।

^{১৮} কল্যাণ রাষ্ট্রের সহজাত সুবিধায় প্রকৃতিগত দিক থেকে সমাজের একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রাংশ কর্মবিমুখ জনগোষ্ঠী অলস জীবন-যাপনে অভ্যস্ত থাকবে। কল্যাণ রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী হিসেবে তারা কখনোই চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হবে না। তবে, সঙ্গত কারণে যেহেতু জেডার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন প্রক্রিয়া তাদের ওপর ক্রিয়াশীল হবে না, সেহেতু তাদের মধ্যে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বিরাজ করবে।

দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক নেই। তবে প্রস্তাবনাটি জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে একটি অপ্রচলিত ও অনুপ্রোচিত পথের সন্ধান দেয়, যা উৎপাদন-বিমুখ বা উৎপাদনহীন বৃহদাংশ জনগোষ্ঠীর অপেক্ষ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অপেক্ষ ও আপেক্ষিক দারিদ্র্য বিমোচনে অভূতপূর্ব গতিশীলতা আনয়নে সক্ষম। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লালিত বিদ্যমান জেডার-দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনকে এখানে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.১ সুপারিশ ও নীতি-পরামর্শসমূহ

মানব সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে জেডার-দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পর্যবেক্ষিত হয়েছে। উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ (output) ও পরিণতি (outcome) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান জেডার-বৈষম্য দূরীকরণে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে গৃহীত হয়েছে বহুবিধ কর্মসূচি। বাংলাদেশেও এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো এখনো অত্যন্ত গ্রন্থিল এবং জেডার-বৈষম্য দূরীকরণে আমাদের সমাজকে এখনো অনেকটা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সমাজের পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় সরকারের একটি মুখ্য ভূমিকা থাকে। প্রয়োজনীয় নীতি-সহায়তা প্রদান, ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণের অর্থ-প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং এ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস মূলত সরকারি ব্যবস্থাপনাই সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর সরকার এ কাজগুলো মুখ্যত তার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। এ কারণে সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদেরকে মূল ঘটক (key agents) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ আবার নীতি প্রণেতা, সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও বাস্তবায়নকারী এ তিনটি স্তরে বিভক্ত। জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নে এ তিনটি স্তরের মধ্যেই উপযুক্ত জেডার সংবেদনশীলতা অপরিহার্য হলেও জেডার সমতায়ন, মূলস্রোতধারায়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব ভূমিকার ভিন্নতা রয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন (যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, পাড়া বা মহল্লা, যুব পরিষদ, সমিতি, বিভিন্ন পেশাজীবী সংঘ ও শ্রেণী সংগঠন ইত্যাদি), বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান (যেমন মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, মাদ্রাসা, মজুব, স্কুল-কলেজ বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণালয় ইত্যাদি) ও সংস্থার (যেমন বিভিন্ন এনজিও, বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকৃতির সংস্থা ইত্যাদি) কাঠামো বিশ্লেষণ করলে এগুলোর সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নীতি প্রণেতা, সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও বাস্তবায়নকারী বা অনুসারী এ তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। সমাজের পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার কর্মসূত্র হিসেবে এ সকল সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা “সামাজিক চেইন-অব কম্যান্ডকে” ব্যাপকভাবে প্রভাবিতকরণে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামগ্রিকভাবে সমাজে বিদ্যমান জেডার-দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে বর্তমান সমীক্ষায় সমস্যা

উত্তরণে তিনটি কৌশলগত প্রণালী দৃষ্টিকোণ (strategic systems approaches) চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সরকারি কর্মকর্তাগণ বা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। এগুলো নিম্নরূপ :

(ক) নীতি পর্যায়ে দৃষ্টিকোণ : কিছু কিছু জেডার-সমস্যা নীতি-পর্যায়ে সম্বোধিত হওয়া প্রয়োজন। সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার একটি বিশেষ গোষ্ঠী, বিশেষত জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সংস্কারকগণ নীতি প্রণয়ন ও বিদ্যমান নীতি সংস্কারকরণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁদের জেডার-দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন জেডার-বৈষম্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এজন্য নীতি প্রণয়ন ও সমাজ-সংস্কারকরণের উপযুক্ত দৃষ্টি প্রসারে এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান জেডার-দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে প্রণীত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে জেডার-ইস্যু সম্পর্কিত উপযুক্ত নীতি-দৃষ্টিকোণ (policy aspects related to gender issues) সন্নিবিষ্ট করা অত্যাাবশ্যক।

(খ) বাস্তবায়ন পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ : জেডার-সমতায়ন, মূলস্রোতধারায়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ সমাজের মানুষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যমান জেডার-বৈষম্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও বাস্তবায়নকারীগণও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ কারণে উদ্দিষ্ট স্তরিক জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তাদের জন্য প্রণীত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে সে ধরনের জেডার-ইস্যু সন্নিবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যা তাঁদের জ্ঞান-ভিত্তিকে (knowledge base) আরো শাণিত করবে এবং তাঁদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, উপদেশনা ও পরামর্শ প্রদান সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞানের (expertise) উন্নয়ন ঘটবে। ফলে একদিকে যেমন তা নিজ জীবনে অনুসরণে আত্মপোলকিত্তে পরিণত হবে, অন্যদিকে সরকারি নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজক্ষিত ফলপ্রসূতা বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

(গ) আত্মপোলকিত্ত ও অনুসরণ পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ : উদ্দিষ্ট উপকারভোগী হিসেবে বিভিন্ন পেশা-শ্রেণীর স্তরিক আম-জনগোষ্ঠীসহ অনেক সরকারি কর্মকর্তা বা বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সংশ্লিষ্ট স্তরিক জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান জেডার-দৃষ্টিভঙ্গি জেডার-সমতায়ন, মূলস্রোতধারায়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের অনুকূল নয়। একারণে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায় না। ফলে কর্মসূচিগুলোর কাজক্ষিত ফলপ্রসূতা অর্জিত হয় না। এজন্য তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনয়নে এবং জেডার সংবেদনশীলতা সৃষ্টিতে স্তরিক জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ-চাহিদার আলোকে প্রণীত

প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে সংশ্লিষ্ট জেডার-ইস্যুসমূহ সন্নিবিষ্ট (incorporate) করা বাঞ্ছনীয়। এতে জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে বিষয়টি তাদের আত্মপোলদ্ধিতে পরিণত হবে এবং এগুলো অনুসরণে তারা স্ব-উদ্যোগী হবে।

উপর্যুক্ত দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় আমাদের দেশে বিদ্যমান স্কুলকায় জেডার-বৈষম্য দূরীকরণে বর্তমান সমীক্ষায় বেশ কিছু সুপারিশ ও নীতি-পদক্ষেপ নির্দেশিত হয়েছে, যা জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার উত্তরণে অনেক সহায়ক হবে। সুপারিশগুলো সমীক্ষার ফলাফল ও চিহ্নিত কৌশলগত দৃষ্টিকোণের আলোকে নিম্নরূপে প্রদান করা হলো :

ক. নীতি প্রণয়ন পর্যায় সম্পর্কিত সুপারিশ ও নীতি-পরামর্শসমূহ

- জীবনের সর্ব পরিসরে জেডার সমতায়ন, জেডার মূলস্রোতধারায়ন, জেডার উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন তথা বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কাম্য উন্নয়নে অবতারণিত জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়নের মোড়ক প্রস্তাবনাটি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করতে হবে।
- জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়নে “নারীর অগ্রসরায়নে জাতীয় নীতিমালা, “জাতীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা” ও জীবনের সর্ব পরিসরে জেডার সমতায়ন, জেডার মূলস্রোতধারায়ন, জেডার উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সরকারের নীতি-সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনগুলোর আদর্শ ও অনুশীলনে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে হবে। এজন্য এ সকল প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনগুলোর ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধিকারী মন্ত্রণালয় বা সংস্থা কর্তৃক অবশ্য পালনীয় সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকা অত্যাাবশ্যক।
- জীবনের সকল পরিসরে নারীর অবদানকে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেয়া বাঞ্ছনীয়। দেশের উৎপাদনশীলতা পরিমাপণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতাকে অর্থনৈতিক ও গাণিতিক বিবেচনায় আনতে হবে। জাতীয় হিসাব নিরূপণ পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থার প্রবর্তনে প্রয়োজনে উপযুক্ত নীতি-সহায়তা সম্প্রসারণ করতে হবে।
- দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হলে যেমন প্রত্যক্ষভাবে নারীর অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যাাবশ্যক, তেমনি বর্ধিত উৎপাদনশীলতায় তাদের ভোগাধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তার অর্থ হচ্ছে, একদিকে যেমন তাদেরকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে হবে, অন্যদিকে উন্নয়নের সুফল যেন তারা ভোগ করতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ততা

যেন সুবিধাভোগীদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে পরিণত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া অত্যাৱশ্যক।

- গ্রামীণ কর্মসংস্থানের পরিসর বৃদ্ধি ও কাম্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি, স্তরিক জনগোষ্ঠীর অবস্থা ভেদে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতায় নারীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতাসমূহের উত্তরণ ঘটিয়ে উৎপাদনহীন বা উৎপাদন-বিমুখ নারীকে উৎপাদনশীল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হলে রাষ্ট্রীয়ভাবে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত উপযুক্ত নীতি-সহায়তা (policy support) এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ ও তার সম্প্রসারণ অপরিহার্য।
- “সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী” ও “সামাজিক নিরাপত্তা সিঁড়ি” কর্মসূচি গ্রহণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত সরকারের অসংখ্য সংস্থা, দপ্তর ও মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন এনজিও, সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত নীতিমালার প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক সমন্বয়হীনতা ও প্রাবরণ দূর করতে হবে এবং বাস্তব পরিসরে উদ্দিষ্ট স্তরিক সমাজ-গোষ্ঠীর প্রকৃত ঝুঁকি-চিত্র অনুসরণসহ কর্মসূচিগুলোর প্রতিষ্ঠানিকীকরণ (institutionalization) নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সরকার পরিবর্তনে এগুলোর প্রকৃতি, পরিসর, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন রূপরেখা পরিবর্তিত না হয়।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বাস্তবায়নাধীন “সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী” ও “সামাজিক নিরাপত্তা সিঁড়ি” কর্মসূচিগুলোর পরিসর বৃদ্ধির প্রয়াস নিতে হবে, এগুলোর প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং লিকেজ বা সিস্টেম-লস্ দূরীকরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী শিক্ষার মত দারিদ্র্য প্রপীড়িত স্তরিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ সৃষ্টি করতে হবে। এ জাতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ তাদের অভূতপূর্ব নিরাপত্তা সিঁড়ি হিসেবে কাজ করবে।
- দেশের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় পুষ্টি-শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে জেডার-বৈষম্য সৃষ্টি সামাজিক এবং আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। গর্ভাবস্থা ও দুগ্ধদান মেয়াদে নারীর প্রতি বিনামূল্যে অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
- চিকিৎসা, শিক্ষকতা, নার্সিং, ডে-কেয়ার সার্ভিসেস, সাচিবিক কর্ম, তথ্য প্রযুক্তিসহ কম্পিউটার, টেলিফোন অপারেটিং, ব্যাংকিং ইত্যাদির মত বর্তমানে প্রচলিত কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নারীর চাকুরি সুবিধা প্রদানে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া উচিত। এ সকল ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নের জন্যও পর্যাপ্ত এবং যথার্থ সুবিধা সম্প্রসারণ করা

বাঞ্ছনীয়। এছাড়া অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিষ্ণু প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস নিতে হবে।

- কর্মজীবী মহিলাদের কর্মস্থলে অধিকতর নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে কোন ধরনের হয়রানি বা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অধিকতর নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- সমাজে বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নে এবং উন্নয়ন ও জাতি গঠন কার্যক্রমে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে দেশে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণীত এবং অনুসৃত হওয়া দরকার।
- দেশের বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় এবং অন্যান্য পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যার মাধ্যমে তাদের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংস্থানকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসনের মত অধিকতর নিরাপদ পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব।
- “নারীর ক্ষমতায়ন”কে জেভার-ইস্যুর একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। এটিকে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত ইস্যুর সাথে সমন্বিত একটি প্যাকেজ-বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
- জাতীয় কৌশলগত কার্যক্রম পরিকল্পনায় প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাসমূহকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধ পদ্ধতির পরিবর্তন আনয়নে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্দিষ্ট স্তরিক জনগোষ্ঠীর উপযুক্ত প্রজনন ও যৌন-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ. বাস্তবায়ন পর্যায় সম্পর্কিত সুপারিশ ও নীতি-পরামর্শসমূহ

- সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট স্তরিক জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক হওয়া অত্যাৱশ্যক।
- নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উন্নতি সাধনে শিক্ষাকে তাদের মৌলিক অস্ত্র (basic tool) হিসেবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।
- দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, মানব উন্নয়ন ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যতের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, প্রণোদনা ও পরামর্শ প্রদান (counselling) জেভার-বৈষম্য দূরীকরণের মৌলিক কৌশল হিসেবে অনুসৃত হওয়া উচিত।
- চিকিৎসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, নার্সিং, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান বা সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি বিশেষ প্রাধান্য সম্প্রসারণ করা বাঞ্ছনীয়।

- কর্ম-পরিবেশে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণে মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। এ ধরনের উৎসাহ প্রদান তাদের সামর্থ্যের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটাবে।
- জেভার প্রশিক্ষণ পরিচালনায় চিহ্নিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উপযুক্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি, মাঠ-পর্যায়ে কর্মরত এনজিও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক নকশায়িত প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, কারিকুলাম ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং অবস্থা ভেদে সময়ে-সময়ে এগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংশোধন ও সমন্বয়প্রয়োগীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানে একটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান মাঠ-পর্যায়ের ফলাবর্তন-তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।
- জেভার প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক প্রণীত জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালায় বর্ণিত প্রশিক্ষণ বাজেট সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর আলোকে নির্ধারিত বরাদ্দ থেকে এ জাতীয় প্রশিক্ষণের ব্যয়-নির্বাহে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

গ. আত্মপোলক্সি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন/অনুসরণ সম্পর্কিত সুপারিশ ও নীতি-পরামর্শসমূহ

- সমাজের সকল পর্যায়ে জেভার-সংবেদনশীলতা সৃষ্টি, বিদ্যমান জেভার-বৈষম্যের আর্থ-সামাজিক পরিণতি এবং সমাজ ও জাতির ওপর জেভার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের বহুমুখী ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধিকরণে স্তরিক জনগোষ্ঠীর আলোকে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যাৱশ্যক।
- সচেতন সমাজে পুত্র-সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি গোপন জেভার-প্রাধান্য (hidden gender preference) এবং সাধারণে প্রবল জেভার-প্রাধান্য বিদ্যমান। এ ধরনের জেভার-প্রাধান্যের পেছনে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণসমূহ একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যদি মহিলারা মা-বাবাকে পুরুষের তুলনায় অধিকতর ভাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হ'ত (যদিও ছেলেরা বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবার দেখাশুনা করবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই), তাহলে জেভার-প্রাধান্যের বর্তমান দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যেত। জেভার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন তথা জেভার-সংবেদনশীলতা সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং লাগসই আইনগত কাঠামোর (appropriate legal framework) উপস্থিতি বিদ্যমান জেভার-বৈষম্য হ্রাসে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।

- জেভার-বৈষম্য সম্পর্কিত ভৌত-পরিবেশ উন্নয়ন অপেক্ষা সমাজে বিদ্যমান মনঃস্তাত্ত্বিক বাধাগুলো অপসারণের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা অত্যাৱশ্যক।
- উদ্বুদ্ধকরণ, প্রণোদনা ও উপদেশনার মাধ্যমে পুষ্টি-অবস্থান (nutritional status) পুনর্গঠনে একটি গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা অত্যাৱশ্যক।
- পারিবারিক ও কর্ম-অবস্থানে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অধিকতর স্বাধীনতা সম্প্রসারণ করা উচিত।
- সরকার বিদ্যমান জনসংখ্যা নীতির পরিবর্তন না আনা পর্যন্ত প্রজননাধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত। নিবিড় উদ্বুদ্ধকরণ (motivation), সচেতনতা বৃদ্ধি (conscientization), ওকালতি (advocacy) ও পরামর্শ প্রদান (counselling) এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৩.২ উপসংহার

সমাজে বিদ্যমান জেভার-সমস্যার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। একারণে তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে সম্বোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জেভার-সমতা, সহমর্মীতা ও সাম্য নিশ্চিতকরণে এবং জেভার সংবেদনশীলতা সৃষ্টি, নারীর মূলস্রোতধারায়ন ও ক্ষমতায়নে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের মুখ্য ঘটক হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একইভাবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত ইতোপূর্বে বর্ণিত স্তরিক জনগোষ্ঠী তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা পালনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। তাদের এ ধরনের ভূমিকা পালন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান জেভার-দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নকশায়িত জেভার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন পদ্ধতি কাঠামোর আওতায় ইতোপূর্বে বর্ণিত তিনটি কৌশলগত প্রণালী দৃষ্টিকোণ (strategic systems approaches) অনুসৃত হওয়া অত্যাৱশ্যক। প্রথমত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গি জেভার-বন্ধুসূলভ হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়ত প্রণীত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের নিজস্ব জেভার-দৃষ্টিভঙ্গি - যা তাঁদের জীবন যাপন প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ করে - তার ইতিবাচক পরিবর্তনসহ এক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান-ভিত্তিকে আরো শাণিত করা এবং তাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, উপদেশনা ও পরামর্শ প্রদান সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানো জরুরী। এতে একদিকে যেমন তা তাদের নিজ জীবনে অনুসরণে মাধ্যমে আত্মপোলক্লিতে পরিণত হবে, অন্যদিকে তারা সরকারি নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে সক্ষমতা অর্জন করবে। তৃতীয়ত সমস্যাগুলো মূলত তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ব্যাপ্ত, যেখানে শিক্ষার অভাব খুবই প্রকট; ধর্মীয় কুসংস্কার যেখানে সমাজের রক্তে রক্তে গভীরভাবে প্রোথিত; সাংস্কৃতিক অন্ধ-বিশ্বাসগুলো যেখানে জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে আছে এবং দারিদ্র্য

যেখানে মানুষের দোর-পোড়ায় কঠোরভাবে হানা দিয়েছে। এ অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ এবং জাতি সকল পর্যায়ে এ সমস্যাগুলোকে একান্ত নিজস্ব সমস্যা মনে করে সংশ্লিষ্ট পরিসরে ফলপ্রসূ উদ্বুদ্ধকরণ, প্রণোদনা ও আত্মপোলক্লির জাগরণী কৌশল (conscientization strategies) গ্রহণ অত্যাৱশ্যক। জেডার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নে বর্তমান সমীক্ষায় অবতারিত মোড়ক প্রস্তাবনাটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া সমীক্ষায় প্রস্তাবিত সহায়ক নীতি-পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত হলে সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়ন প্রক্রিয়াটি আরো ত্বরান্বিত হবে। NCWD এগুলো বাস্তবায়নে প্রবর্তকের (pioneer) ভূমিকা পালন করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে জেডার-মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলায়নের নিমিত্তে অবতারিত মোড়ক প্রস্তাবনাটি অনুসৃত হলে সমাজের উৎপাদনহীন বা উৎপাদন-বিমুখ বৃহদাংশ জনগোষ্ঠী উৎপাদনশীল শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত হবে, উন্নয়নে নারীর বিদ্যমান ভূমিকার ব্যাপক পরিবর্তন আসবে, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং অনপেক্ষ উৎপাদনশীলতার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করবে। সমাজের দরিদ্রতম অংশের মধ্যে নারীর এ ধরনের অংশীদারিত্ব ও শক্তি অর্জন প্রকারান্তরে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন ঘটাবে। মোড়ক প্রস্তাবনাটি মূলত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত হলেও সার্কভুক্ত দেশসমূহে বা অনুরূপ আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত দেশ ও রাষ্ট্রসমূহে বাস্তবায়িত হলে তা একই ধরনের ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

- Abu-Habib, Lina. (1998) : "Middle and Near East". In : *Gender Training : The Source Book — Gender, Society and Development*. Royal Tropical Institute, KIT Press and Oxfam GB, Amsterdam, The Netherlands.
- Hirschman, Albert O. (1967) . : *Development Projects Observed*. (Washington D.C. Brooking Institution).
- Kasente, H. Deborah. (1998) : "Estern and South Africa". In : *Gender Training : The Source Book — Gender, Society and Development*. Royal Tropical Institute, KIT Press and Oxfam GB, Amsterdam, The Netherlands.
- Neaz, Ahmad A. N. (2005). : *Reproductive Health and Gender Training Manual*. Advocacy on Reproductive Health and Gender Issues through the Training Institutes of the Ministry of Establishment Project, BPATC, Savar, Dhaka and UNFPA, Bangladesh.
- Royal Tropical Institute (1998) : *Gender Training : The Source Book — Gender, Society and Development*. KIT Press and Oxfam GB, Amsterdam, The Netherlands.
- Sen, Gita et. al. Ed. (1994). : *Population Policies Reconsidered : Health, Empowerment and Rights*. Harvard Series on Population and International Health, HCPDS & IWHC, New York.
- The Government of the People's Republic of Bangladesh (2005) : *Unlocking the Potential : National Strategy for Accelerated Poverty Reduction*. General Economic Division, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka.
- The World Bank (1994). : *Enhancing Women's Participation in Economic Development*. A World Bank Policy Paper, Washington D. C..
- UNDP-FEMNET (2000) : *Training of Trainers in Gender Mainstreaming : A Workshop for Anglophone African Countries*, Kampala, Uganda, December 10-16, 2000.
- UNDP (2003). : *Human Development Report 2003*. Oxford University Press.
- Web Site (2002).: Strategis.gc.ca,
- ইমাম, কাজী হাসান (২০০৩). : *পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন : বাংলাদেশ পরিশ্রেক্ষিত*. প্যারাগন পাবলিশার্স, এঞ্জেল প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা।

ইমাম, কাজী হাসান (২০০৩). : জেডার মূল্যবোধের সামাজিক পুনঃপ্রকৌশলয়ন : দারিদ্র্য
বিমোচন ও বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনশীলতার বিকল্প পরিবেশনা পদ্ধতি.
একটি গবেষণা মিমিও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৫). : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫. অর্থ
বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মজুমদার, ড. বদিউল আলম (২০০৩). : কন্যাশিশু : বৈষম্যের অবসান হোক বাল্যকাল
থেকেই. প্রথম আলো, ২৯.০৯.২০০৩, ঢাকা।

মজুমদার, ড. বদিউল আলম (২০০৩). : নারী ও শিশু : বৈষম্য ও বঞ্চনার নির্মম পরিণতি.
প্রথম আলো, ২৩.০২.২০০৩, ঢাকা।

সংযোজনী-১

গৃহীত বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী ও নিরাপত্তা সিঁড়ি কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচি	সামাজিক নিরাপত্তা সিঁড়ি কর্মসূচি
(ক) নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি/কার্যক্রম	
(১) বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, (২) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি, (৩) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কর্মসূচি, এবং (৪) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি।	(১) এসিডদন্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষুদ্রঋণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, (২) শিক্ষার বিনিময়ে অর্থ সহায়তা কর্মসূচি, (৩) প্রাথমিক শিক্ষাবৃত্তি, (৪) মাধ্যমিক ছাত্রীবৃত্তি, এবং (৫) পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি।
(খ) খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি/কার্যক্রম	
(১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি।	(১) ভিজিডি, (২) ভিজিএফ, (৩) জিআর, এবং (৪) টেষ্ট-রিলিফ।
(গ) দারিদ্র্য বিমোচন বিশেষ কর্মসূচি/কার্যক্রম	
(১) প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, (২) আবাসন, (৩) অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলা, (৪) তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা, এবং (৫) গৃহহীনদের গৃহঋণ ও অনুদান।	(১) দারিদ্র্য বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন (২) পশুসম্পদ খাতে পুঁজি গঠন, আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান, (৩) দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ (মৎস্য অধিদপ্তরের), (৪) কর্মসংস্থান ব্যাংক (বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে), এবং (৫) সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি/কার্যক্রম।
(ঘ) আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি/কার্যক্রম	
	(১) সরকারি দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি/কার্যক্রম, (২) আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন, (৩) স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম, (৪) মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, (৫) নগরভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রম, (৬) গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র, (৭) মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন, (৮) দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় কার্যক্রম, এবং (৯) বিসিক পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

(ঙ) দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি/কার্যক্রম

	(১) দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, (২) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি, (৩) স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম, (৪) নগর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, (৫) দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, (৬) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, (৭) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, (৮) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, এবং (৯) সমাজ সেবা কার্যক্রম।
--	---

(চ) দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিও-দের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি/কার্যক্রম